বঙ্গ-সংস্কৃতি কথা



শ্রীপ্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

শৈব্যা পুস্তকালয় ● পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নভেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

দু' চার কথা

'বঙ্গ-সংস্কৃতির-কথা'র পরিকল্পনা শ্রীরবিন বলের। তাঁরই আগ্রহে বইটি লেখা সুরু করে বুঝতে পারি এ ধরণের বই তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা কতখানি দুরূহ। একে তো সংস্কৃতির ব্যাখ্যা নিয়ে সুধীবৃন্দের মধ্যেই বিতর্কের অন্ত নেই, তার উপর বাংলা দেশের বহু বৈচিত্র্যে ভরা সংস্কৃতির রূপ-রেখাটি ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল মনে অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের মাধ্যমে এঁকে দেবার জন্য দরকার গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরস ও সাবলীল রচনাশৈলীর। দেশ-বিখ্যাত মনীষিবর্গের সস্নেহ প্রশংসা সত্ত্বেও আমি আমার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন। আর এও জানি এমন অনেক তথ্য গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে যা বিতর্কাতীত নয়। তথ্য সন্নিবেশে অনেক অপূর্ণতাও রয়ে গেল।

ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিমার্জনের অপেক্ষায় রইল। তথ্যজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপদেশ ও নির্দেশ সানন্দে গৃহীত হবে।

সুবিখ্যাত হাণ্টার সাহেবের বিবরণী, ও'ম্যালি ও কুপল্যাণ্ডের গেজেটিয়ার, এ ছাড়া ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে গ্রন্থটির অধিকাংশ উপাদান সংগৃহীত। তদুপরি খ্যাত, অখ্যাত, নতুন, পুরাতন, বহু লেখকের পুস্তক ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকেও সাহায্য পাওয়া গেছে। এঁদের সকলের নিকট ঋণ স্বীকার করি।

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস মহাশয়ের তোলা আলোকচিত্রগুলি তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা উমা বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি-টি, মহাশয়ার সাহায্য ব্যতীত সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত না। এঁদের দু'জনকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

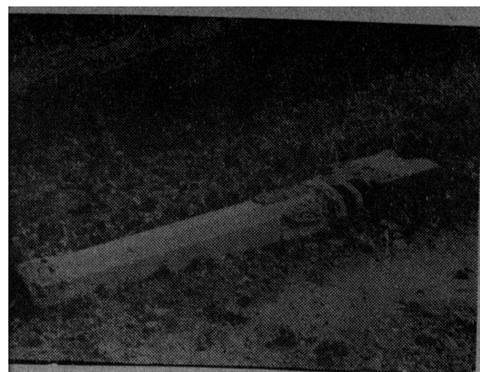
গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন বলের অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বিনীত—

সুলভ সংস্করণের ভূমিকা

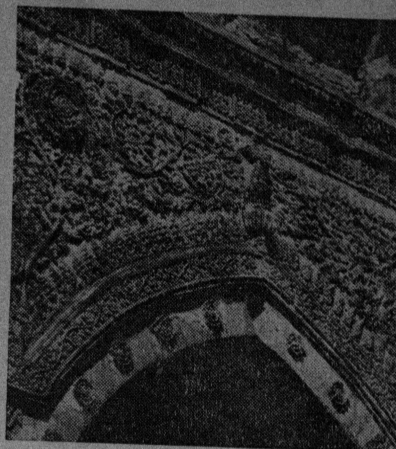
মাত্র তিনমাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণটি নিঃশেষ হওয়ায় প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। এ সংস্করণে ডঃ রমেশ মজুমদারের মূল্যবান মতামত ও অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকাচিয়নের সৌজন্যে প্রাপ্ত আলোক-চিত্রটি সংযোজিত হ'ল। বিনীত—

প্রকাশক

সূচীপত্র

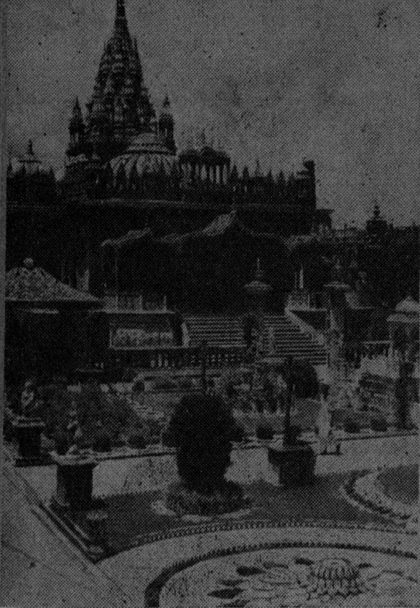


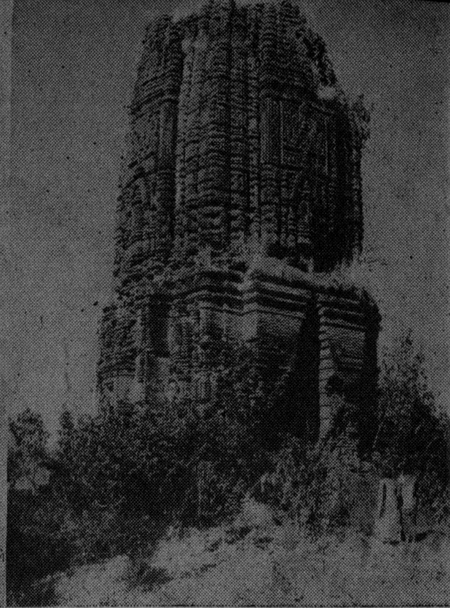
হিন্দুযুগের প্রাচীন পুরাকীর্তি, বাণগড়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ডেভিড
ম্যাকাচিয়ান এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।)



মসজিদের অলংকরণ, গৌড়, মালদ

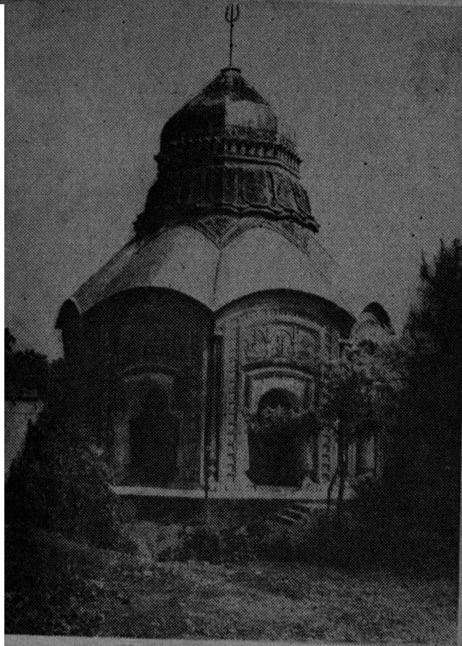
জটেশ্বর নাথে
মন্দির, মহানা
হুগলী।





পরেশনাথের মন্দির, কলিকাতা ● ইষ্টক নির্মিত রেখদেউল, বড়ম্—পুরুলিয়া

র ছবি)—বাঘের দেবতা, দক্ষিণরায় (বাবাঠাকুর) ধপধপি, ২৪ পরগণা

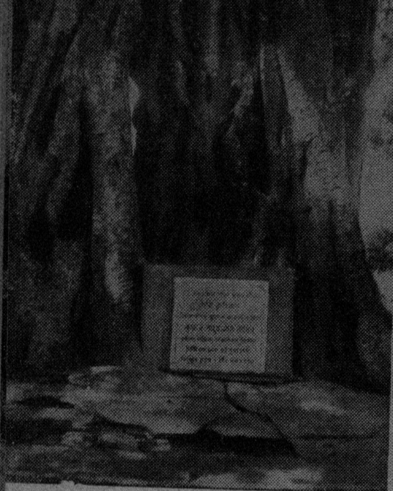




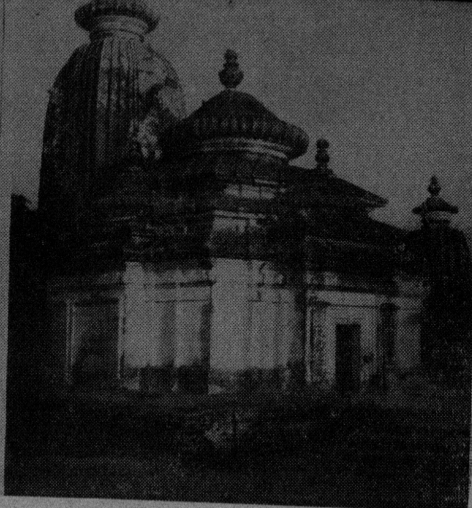
রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির, মুর্শিদাবাদ • চা-পাতা সংগ্রহ, জলপাইগুড়ি

শৈবতীর্থ ও সত

বক্রেশ্বর, বীর



ত্তিবাসের রামায়ণ রচনার স্থান,
ফুলিয়া, নদীয়া।



কর্ণগড়ের মন্দির,
মেদিনীপুর



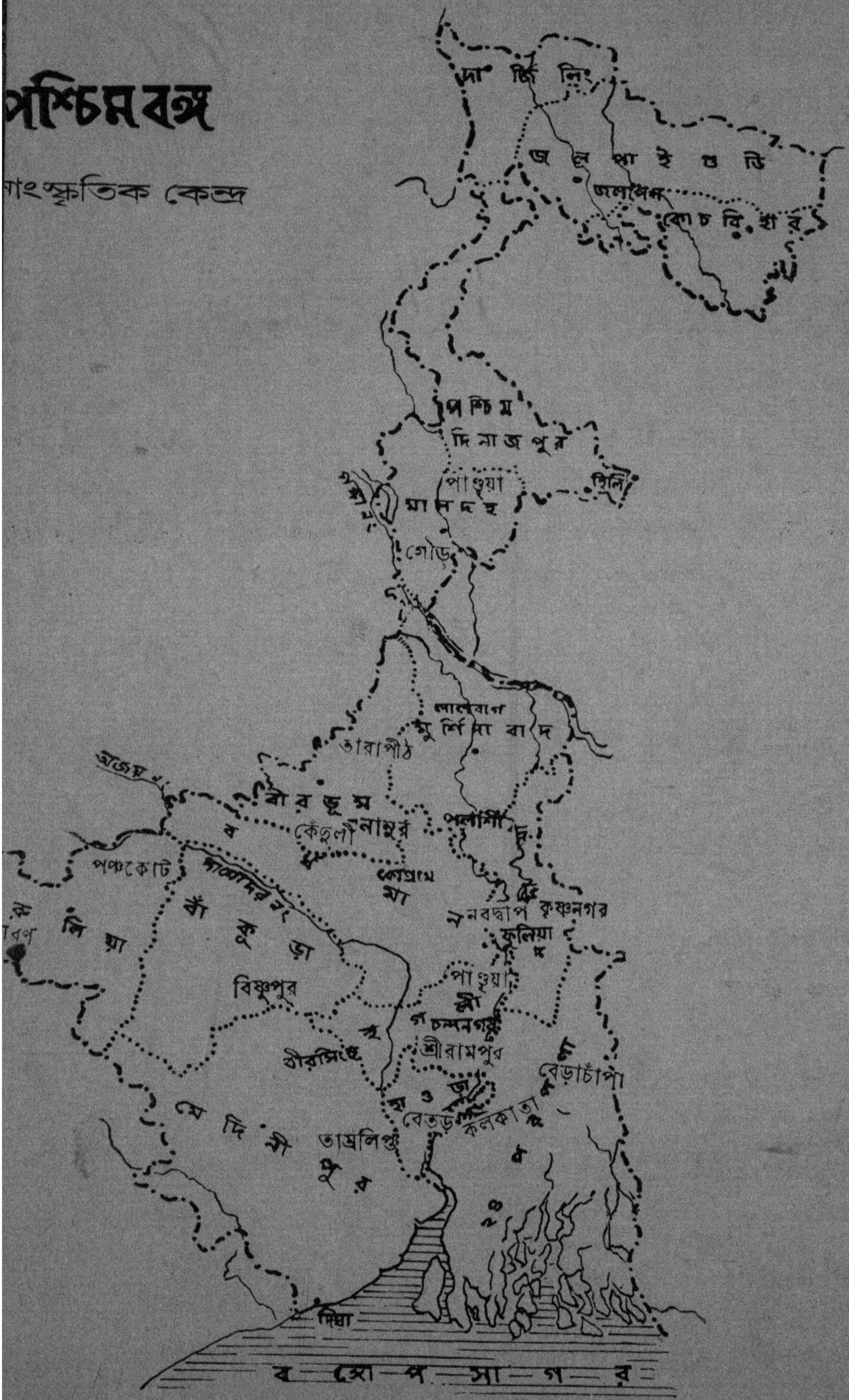
কোচবিহারের উপজাতি



ইস্পাতের কারখানা
বার্ণপুর, বর্দ্ধমান

তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য, দার্জিলিং   বিবেকানন্দের স্বপ্নসৌধ—বেলুড়, হাওড়া

(নীচের ছবি)—মন্দিরগাত্রের শিল্পনিদর্শন, বহুলাড়া, বাঁকুড়া



পশ্চিমবঙ্গ
াংস্কৃতিক কেন্দ্র
দা র্জি লিং
জ ল পা ই গু ড়ি
জলপাইগুড়ি
কো চ বি হা র
প শ্চি ম
দি না জ পু র
হিলি
পাণ্ডুয়া
মা ল দ হ
গৌড়
লালবাগ
মু র্শি দা বা দ
তারাপীঠ
অজয়
বী র ভূ ম
কেঁদুলী
নানুর
পলাশী
পঞ্চকোট
দামোদর নদ
বাঁ কু ড়া
লি য়া
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
ফুলিয়া
পাণ্ডুয়া
বিষ্ণুপুর
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
বীরসিংহ
বেড়াচাঁপা
বেতড়
কলকাতা
মে দি নী পু র
তাম্রলিপ্ত
দিঘা
ব ঙ্গো প সা গ র

বঙ্গ-সংস্কৃতি-কথা

প্রাচীন বাংলার পরিচয়

স্বাধীন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। সুপ্রাচীন বঙ্গদেশের উহা এক খণ্ডাংশ মাত্র। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বলেন হাজার হাজার বৎসর পূর্বে মহাসাগরের সুনীল জলরাশি একদিন বঙ্গদেশের উপব প্রবহমান ছিল।

বঙ্গদেশেব নাম প্রথম পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গ নদীবাহিত পলিতে গঠিত হলেও প্রাচীন বঙ্গের উত্তরের পার্বত্যভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ভূমি অতি পুরাতন।

চট্টগ্রামে, হুগলী জেলায়, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রত্নপ্রস্তব যুগেব (Paloelithic Age) প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সিংহভূম, ধলভূম ও মানভূমে নবা প্রস্তরযুগেব (Neolithic Age) কুঠাব, মুষল, গদা, ছুরিকা ইত্যাদি পাথবের অস্ত্রেরও খোঁজ পাওয়া গেছে। মেদিনীপুব জেলার তামাজুড়ী গ্রামে পাওয়া তাম্রযুগের অলঙ্কার ও অস্ত্র দেখে মনে হয় বঙ্গদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাটি কত সুপ্রাচীন।

ইংরাজযুগে বঙ্গদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। যথা, প্রেসিডেন্সী, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ। মুঘল যুগে প্রদেশকে বলা হত সুবা। বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। ইংবাজ আমলেও এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ করে বাঙালীর সংহতি শক্তিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ তৈরী করেন আর পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেন। তবে সে ব্যবস্থা বাঙালী মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণেরা ফাঁসীতে আত্মোৎসর্গ করে বানচাল করে দেন। লর্ড কার্জনের settled fact-কে তাঁরা

unsettled করেন। ১৯১১ সালে তৎকালীন ইংরাজ শাসকগণ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মিলন ঘটাতে বাধ্য হন। বিহার ও উড়িষ্যা সংযুক্তভাবে স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে গণ্য হয়। ১৯৩৬ সালে বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক পৃথক প্রদেশ রূপে স্বীকৃতি পায়।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রধান ভৌগোলিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম বঙ্গকে বলা হত রাঢ় দেশ বা সুহ্ম, উত্তর বঙ্গকে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র নামে অভিহিত করা হত, মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গকে বলা হত সমতট বা বগড়ী; পূর্ববঙ্গ, বঙ্গ নামে আর পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গ বাঙ্গালা নামে অভিহিত হত। পূর্ববঙ্গ নদী নালার দেশ, সেখানে আল বা বাঁধের অভাব নেই তাই সে দেশের নাম বঙ্গ + আল = বাঙ্গাল দেশ। আকবর বাদশাহের মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বঙ্গদেশকে বাঙ্গালা দেশ নামেই অভিহিত করেছেন।

পাঠান শেরশাহ সুবা বাঙ্গালাকে কয়েকটি সরকার ও প্রত্যেকটি সরকারকে পরগণায় ভাগ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালা দেশকে ১৩টি চাকলায় ভাগ করেন। ইংরাজ আমলে সে ব্যবস্থা রদ হয়—বঙ্গ প্রদেশকে ৫টি বিভাগে ও ৫টি বিভাগকে ২৭টি জেলায় ভাগ করা হয়। জেলাগুলিকে আবার কয়েকটি মহকুমায় আর মহকুমাগুলিকে কতকগুলি থানায় ভাগ করা হয়। হিন্দু আমলেও রাজ্যগুলি ভুক্তি (বিভাগ), বিষয় (জেলা) বীথী (মহকুমা) চতুরক (থানা) মণ্ডল (পরগণা) ইত্যাদিতে ভাগ করে শাসন কার্য চালানো হ'ত। তখন সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। আর গ্রামগুলিও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বায়ত্তশাসিত।

বাংলার প্রখ্যাত পালরাজগণের রাজধানী ছিল গৌড়। পাল-রাজগণ চারিশত বৎসর আর্যাবর্তের উপর আধিপত্য করেন। আর্যাবর্তের ভাষাকে এককালে গৌড়ের ভাষা বলা হ'ত। পঞ্চগৌড় বলতে তখন সারস্বত (পূর্ব পাঞ্জাব), কান্যকুব্জ, মিথিলা, উৎকল ও বঙ্গীয় গৌড়কে বোঝাত। রাজধানীর খ্যাতিতে রাজ্যের নাম

গৌড় হয়। হিন্দুযুগের শেষে পাঠানযুগেও গৌড়ের খ্যাতি অম্লান ছিল। কিন্তু মুঘলযুগের সূত্রপাতের কালে গৌড় ধ্বংস হয়। বঙ্গের রাজধানী প্রথমে রাজমহলে (আকবরাবাদ) ও পরে ঢাকায় (জাহাঙ্গীরাবাদ) স্থানান্তরিত হলে গৌড়ের গৌরব অস্তমিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয়দের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন—'শক হূণ দল, মোঘল, পাঠান এক দেহে হ'ল লীন' কিংবা প্রতিটি ভারত-বাসীর রক্তের মধ্যে শুনেছেন 'আমার শোণিতে হতেছে ধ্বনিত তার বিচিত্র সুর'। এ কথাগুলি বাঙালী জাতির প্রতি যতখানি নির্ভুল ভাবে প্রযোজ্য ততখানি বুঝি আর ভারতবর্ষের কোন জাতির প্রতি নয়।

নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন পাঁচ ছ' হাজার বছর আগে বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলোতে বাস করতো স্প্রিংএর মত পাকানো কালো চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু মানুষেরা। সুন্দরবন অঞ্চলে ক্বচিৎ কখনো এমন ধরনের চুলওয়ালা মানুষের দেখা মেলে। এর পরে আসাম উপত্যকার মধ্য দিয়ে বাংলায় এল অষ্ট্রিক জাতের লোক। এদের রঙ ছিল হলদেটে। নেগ্রিটো জাতের লোকের সঙ্গে এদের মিশ্রণের ফলে কোল বা মুণ্ডা জাতের উদ্ভব হয়। অষ্ট্রিক জাতের অসভ্য বংশধরা আজও সাঁওতাল মুণ্ডা, শবর, ভীলরূপে বর্তমান। সুসভ্য অষ্ট্রিকরা কৃষিকার্য জানতো। ধান, পান, হলুদ, সিঁদুর, কলা, সুপারি প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য বাঙালী এদের কাছে ঋণী। তুলার কাপড়ের ব্যবহারও এরা শিখিয়েছেন।

এর পর এল দ্রাবিড়েরা। এরা উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মহেন-জো-দারো ও হরপ্পার স্থাপত্য কীর্তি এদের বলেই মনে হয়। ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি এদের বংশজাত। আর্য অধিকারের পূর্বে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির অবাধ মিলনের ফলে প্রাচীন বাঙালী জাতির উৎপত্তি। ভোট চীন জাতীয় লোকেরাও

বাংলায় প্রবেশ করেছিল হাজার দুই বছর আগে। মেচ, কোচ প্রভৃতি জাতির লোকেরা এদের বংশধর।

পণ্ডিতেরা বলেন এর পর এল আর্যরা। এরা অতিশয় শক্তিমান, কল্পনা-শক্তিও এদের প্রখর, সবচেয়ে বড় কথা এরা সংঘবদ্ধ। উত্তর ভারতে এদের কাছে পরাজিত হয়ে অনার্য দ্রাবিড়েরা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নেয়। বাকী অনার্যগণ আর্যদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে আর্য আচার ও বৈদিক যাগযজ্ঞকে স্বীকার করে নেয়। আর্য অনার্যের মধ্যে দ্রুত সংমিশ্রণ চলতে থাকে। আর্যরাও অনার্যদের পৌরাণিক পূজাদি, মন্ত্র-তন্ত্রাদি গ্রহণ করতে থাকে। বাঙ্গালী কিন্তু সহজে আপন প্রাচীন বৈশিষ্ট্য হারায় নি। প্রাচীন আর্য-গ্রন্থাদিতে তাই বঙ্গদেশের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হত পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। পাণ্ডবরাও এদেশকে বর্জন করেছিলেন। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন আর্যরা বাঙালীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল।

বৈদিক-ধর্ম-বিরোধী কিছু কিছু আর্য বাংলা দেশে এসে দ্রাবিড় জন-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়। উত্তর ভারতে যখন বৌদ্ধ, জৈনধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে তখন আর্য ধর্ম-বিরোধী বাংলাদেশ এই দুই ধর্মকে আগ্রহের সঙ্গে বরণ করে নেয়। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈনধর্মের সঙ্গে এল বৈদিক আর্যভাষা। সে ভাষার আধারে এসেছিল আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি। ধীরে ধীরে আর্য ভাষা ও ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হ'ল। বাংলাদেশে আর্য অনার্যের মিলন ঘটলে নতুন বাঙালী জাতি সৃষ্ট হল, এই জাতির কর্ণধার হলেন খাঁটি বাঙ্গালা রাজবংশের পালরাজগণ। এঁদের আমলেই প্রাচীন বৈদিক আর্যভাষার থেকে উদ্ভূত মাগধী অপভ্রংশ থেকে খাঁটি বাংলা ভাষার জন্ম হয়। যার নিদর্শন আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির নাম চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। এটির বাংলা ভাষা আনুমানিক হাজার খানেক বছরের পুরানো।

বাংলার সেনরাজবংশ দাক্ষিণাত্য থেকে আগত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বংশজাত। এঁরা বিদেশী হলেও বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে

এই রাজবংশের বল্লাল সেনের নাম স্মরণীয়। সেনবংশের পতনের পর বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে যায়।

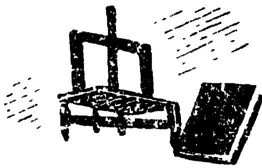
মুসলমানগণ বাংলাদেশকেই বাসভূমি রূপে গ্রহণ করে এদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তখনও উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয় নি তাই বাংলা ভাষাই হল তাঁদের ভাষা। উচ্চবর্ণ কর্তৃক অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উদার সুফী মতের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। দরবেশ মীর, পীর, ফকিরগণের প্রচারে বহু লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন। বাঙালী বৌদ্ধরা অনেকেই মুসলমান হয়ে যান। আর বেশীর ভাগ হন বৈষ্ণব। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় আর আর্য নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। আর্য ও অনার্য ধর্ম সংস্কৃতির সমীকরণের ফলে বাঙালী-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের হয়েছিল উৎপত্তি। এবার নবাগত মুসলমানগণ দ্বারা আনীত কৃষ্টিও পুরাতন ধারাকে পরিপুষ্ট করলো। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ব্যবধান সত্বেও ভাষা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক হয়ে গেল, কারণ এদের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত। তারা প্রায় সকলেই একই নরগোষ্ঠীর সন্তান, একই ভাষা ও সংস্কৃতির তারা উত্তরাধিকারী।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটলো। পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত আর বঙ্গদেশ ত্রিখণ্ডিত হ'ল। ঢাকা, চট্টগ্রাম দুটি বিভাগ ছাড়াও প্রেসিডেন্সী আর রাজসাহী বিভাগের অধিকাংশ জেলা আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলা সমেত পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যোগসূত্রও রইল না। ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের অংগরাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস হলে মোট ১৬টি জেলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। বর্তমানে রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে একটি অতি সঙ্কীর্ণ ভূভাগ রাজ্যটির অখণ্ডতা রক্ষা করছে।

ষোলটি জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয় দেবার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ বাংলা দেশের প্রাচীন পরিচয় দেবার অর্থ হ'ল শাসনকার্যের

সুবিধার জন্য জেলার ভিত্তিতে প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়েছে মাত্র। আর কে না জানে যে কোন কৃত্রিম সীমানা দিয়ে সাংস্কৃতিক বিভাজন সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক বিচারে, বহিরঙ্গের আপাত বৈপরীত্য সত্ত্বেও বাংলার আত্মিক সত্তা এক ও অখণ্ড। তা ভারতবর্ষের বিপুল সাংস্কৃতিক সত্তারই অঙ্গীভূত।

১



হুগলী

হুগলী জেলার নামের উৎপত্তি হয়েছে হোগলা থেকে। সেকালে ভাগীরথী নদীর তীরে অনেক হোগলাগাছ জন্মাত। পর্তুগীজরা যখন হুগলী অঞ্চলে তাদের ব্যবসার কুঠি তৈরী করে তখন তাদের মুখে মুখে হোগলা শব্দটি হুগলীতে পরিণত হয়। অনেকে বলেন তা নয়, হুগলী শব্দটি এসেছে ওগলী থেকে। পর্তুগীজ ভাষায় ওগলী অর্থে গুদাম ঘর। এ অঞ্চলে বণিকদের মালপত্র রাখার জন্য অনেক গুদাম ঘর তৈরী হয়েছিল তাই জায়গাটার নাম হয় ওগলী। তারপর লোক মুখে বদল হয়ে বলা হয় হুগলী।

ইউরোপীয় বণিকরা হুগলী জেলার পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর নাম দিয়েছিল হুগলী নদী। সে নাম আজও চলে আসছে। প্রাচীন কালে হুগলী অঞ্চল ছিল বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা বর্ধমানকে দুভাগে ভাগ করে দক্ষিণ অংশের নাম দেয় হুগলী জেলা। তারপর নানা পরিবর্তনের পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী বর্তমানের রূপ নেয়। জেলাটির উত্তরে বর্ধমান, পশ্চিম দিকে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা আর দক্ষিণে হাওড়া জেলা। ভাগীরথী নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরী হুগলী

জেলার সমতল ভূমি। শুধু জেলার পশ্চিম প্রান্তে গোঘাট মহকুমায় রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ পাথুরে মাটি দেখা যায়। ভাগীরথী ছাড়া দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ জেলাটির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে।

পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী হুগলী জেলার বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে। সুপ্রাচীন সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্তের গৌরব যুগের অবসানে সরস্বতী নদীতীরের সপ্তগ্রাম পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর রূপে গড়ে ওঠে।

সপ্তগ্রামের বন্দর থেকে দূর সমুদ্র পারে সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, বলী প্রভৃতি দেশে বাঙালী বণিকেরা বাণিজ্য যাত্রা করতেন। ইউরোপের বাজারে সপ্তগ্রামের বন্দর থেকে আমদানী করা সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা ছিল প্রচুর। সুসভ্য রোমান রমণীরা বাঙালী তাঁতির তৈরী কাপড় পরে গৌরব বোধ করতেন। আজও হুগলী জেলার ধনিয়াখালি, সিমুলিয়া, ফরাসডাঙা, রাজবলহাট প্রভৃতি অঞ্চল উত্তম বস্ত্রের জন্য খ্যাতির অধিকারী। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে।

এই সব শহরে যত সৈদাগর বৈসে।
কত ডিংগা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥

মুসলমান আমলে সপ্তগ্রাম ছিল হুগলী জেলার সদর কর্মস্থল। বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে নানা বর্ণের মানুষ জীবিকার তাগিদে গঙ্গাতীরের দেশ হুগলীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। সপ্তগ্রামই ছিল তাঁদের কর্মকেন্দ্র। সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রামের মর্যাদা হ্রাস পায়।

হুগলী জেলার অন্য একটি বন্দর ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সেই বন্দর হুগলী। হুগলীতে যখন পর্তুগীজরা প্রথম আসে তখন

সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস নামে দুই ভ্রাতা। এঁরা ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। নবাব সরকার থেকে এঁরা রাজা ও মজুমদার উপাধি পেয়েছিলেন। বার্ষিক ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ছিল এঁদের। তার মধ্যে বারো লক্ষ টাকা এঁরা গৌড়েশ্বরকে খাজনা দিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী, সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। অগাধ ঐশ্বর্য ও সুন্দরী পত্নীকে ত্যাগ করে তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় নিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ছয়জন শ্রেষ্ঠ পরিকরের মধ্যে একমাত্র রঘুনাথই ছিলেন কায়স্থ।

সপ্তগ্রামে রঘুনাথের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন বিগ্রহের বর্তমান মন্দিরটি দানবীর মতিলাল শীলের পিতামহীর দানে নির্মিত। এটা এখন রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট বলে খ্যাত। এই রঘুনাথের পিতা রাজা গোবর্ধন দাসের কাছ থেকে ভাগীরথী তীরে কিছু জমি কিনে গোলাঘাট নামক স্থানে পর্তুগীজরা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। সেইখানেই হুগলী শহরের পত্তন হয়।

হুগলী জেলার ভাগীরথী তীরে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে পর্তুগীজরা একটি বন্দর তৈরী করে। সেখানে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে একটি গীর্জাও তৈরী করে। তা আজও বিদ্যমান। এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম গীর্জা। হুগলীর বাণিজ্য থেকে পর্তুগীজদের প্রচুর অর্থ লাভ হত।

পরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে হটে গিয়ে বোম্বেটেগিরি করাকেই তারা পছন্দ করত বেশী। দক্ষিণ বাংলার গ্রামগুলো থেকে তারা বালক-বালিকা চুরি করে নিয়ে বিদেশে বিক্রি করত দাসরূপে। গ্রামগুলো লুণ্ঠন করে নিরীহ মানুষদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। এমন কুকার্য ছিল না, যা তারা করত না। এসব সংবাদ দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহানের কানে ওঠে। বাদশাহ মহা বিরক্ত হয়ে হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন। হুগলীর অধিকার নিয়ে পরবর্তীকালে ইংরেজ-মোগলে বার বার সংঘর্ষ হয়েছে।

পর্তুগীজরা হুগলীতে আসার পূর্বে বাংলাদেশে সেন-রাজবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান পীর, গাজী আউলিয়ার দল বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে আস্তানা গেড়ে বসে। সেন-রাজাদের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে বা রাঢ়বঙ্গে শেষ হলেও ছোট ছোট হিন্দু রাজার অভাব ছিল না। দূর দিল্লী থেকে এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ ছিল না। তাই পীর, গাজীর দল এইসব হিন্দু রাজার রাজ্যে বাস করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন আর মুসলমানদের উপর কোন অন্যায় আচরণ ঘটলে দিল্লীর বাদশাহকে জানিয়ে দিতেন। তখন দিল্লীর সৈন্য এসে সেই হিন্দুরাজ্য দখল করত। এমনি করেই একদিন হুগলী অঞ্চলের পাণ্ডুয়া মহানাদ ত্রিবেণীতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার মত হুগলীর পাণ্ডুয়াও ইতিহাস বিখ্যাত। কথিত আছে বুদ্ধদেবের এক পিতৃব্যপুত্র পাণ্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুদাস নামে সেই বংশের কোন রাজা ছোট পেঁড়ো বা পেঁড়ো বসন্তপুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। জনৈক নগর ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় পাণ্ডুরাজা দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহসুফীর কাছে পরাজিত হন। পাণ্ডুয়া শাহসুফীর দখলে যায়।

পাণ্ডুয়ার হিন্দুযুগের মঠ, মন্দির ধ্বংস করা হয়। শুধু ১৩৬ ফুট উঁচু একটা মন্দির স্তম্ভ বিজয় স্তম্ভরূপে রক্ষা করার জন্য শাহসুফী আদেশ দেন। এটিকে সংস্কার করিয়ে দিল্লীর কুতবমিনারের আকারে গঠন করা হয়। বাংলাদেশে যে কয়টি প্রাচীন গৃহ বা মিনার আজও টিকে আছে এটি তার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৬১টি ধাপ-বিশিষ্ট ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে পাঁচতলা এই মিনারের মধ্যে। প্রতি বছর আজও বৈশাখ ও মাঘ মাসের প্রথম দিন এই মিনারের নিচে মেলা বসে।

শাহসুফীর সমাধি স্থান এখানকার একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। এই সমাধির একটি শিলালিপি আরবী হরফে লেখা। কিন্তু তার পিছন

দিকে সূর্যদেবের মূর্তি উৎকীর্ণ। মনে হয়—মালদহের গৌড়-পাণ্ডুয়ায় যেমন হিন্দু-মঠ-মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল, হুগলীর পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণীতেও ঠিক তেমনি ব্যাপারই ঘটেছিল।

ত্রিবেণীর জাফর খাঁর পাঁচ গম্বুজওয়ালা মসজিদের শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মসজিদের কাছে পাওয়া পাথরে উৎকীর্ণ সংস্কৃতলিপির সন্ধান মিলেছে। মসজিদের সংলগ্ন সমাধি ভূমি থেকে হিন্দু দেবদেবীর শুধু নয় বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ বাংলা দেশের সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে।

বামদিকে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলন-স্থল বলে জায়গাটার নাম ত্রিবেণী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের সঙ্গে ত্রিবেণীর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। সেকালে সমুদ্রগামী জাহাজ সপ্তগ্রাম যাবার পথে ত্রিবেণীতে নোঙর করত। ষোড়শ শতক পর্যন্ত ত্রিবেণী ছিল পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ত্রিবেণীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সময়। জগন্নাথ পণ্ডিত এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এঁর জন্ম ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে। ত্রিবেণীতে চব্বিশ বছর বয়সে টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। মৃত্যুর একমাস আগে পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন অর্থাৎ প্রায় নব্বই বছর একটানা অধ্যাপনা করে অধ্যাপনার ইতিহাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে গেছেন।

সেকালে সংস্কৃত চর্চার জন্য নবদ্বীপের খ্যাতি ছিল—বাংলার অক্সফোর্ড বলে পরবর্তীকালে নবদ্বীপকে গণ্য করা হয়েছে। সেই নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার খ্যাতিকে একক প্রতিভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিষ্প্রভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি কাহিনী এই।

একদিন বালক বয়সে জগন্নাথ তাঁর জ্যাঠা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাঁশবেড়িয়ার টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়ছেন। জ্যাঠা ভবদেব তাঁর এক ছাত্রকে স্মৃতিশাস্ত্রের কূটবিষয়ের মীমাংসা গ্রন্থ 'দ্বৈতনির্ণয়' পড়াচ্ছেন। গ্রন্থটি ভবদেবেরই জ্যাঠামহাশয় চন্দ্রশেখর বাচস্পতির রচনা। গ্রন্থের একস্থানের অর্থ দুরূহ থাকায় তার অর্থ নিষ্পত্তি না করতে পেরে ভবদেব তাঁর ছাত্রকে বললেন—এই জায়গাটার অর্থ জ্যাঠামশায় ঠিক ধরতে পারেন নি। কাছেই বসে পড়ছিলেন জগন্নাথ। তিনি সব ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন। হেসে জ্যাঠামশাই ভবদেবকে বললেন—মহাশয়ের জ্যাঠামহাশয় অর্থ ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন, তবে আমার জ্যাঠামহাশয় অর্থটি ধরতে পারছেন না। এটাকে পাকামো বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা নয়।

জগন্নাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা সেকালের ইংরেজ শাসকদেরও অজ্ঞাত ছিল না। তাই যখন হিন্দুদের দেওয়ানী মামলার বিচারের সময় একটা ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম জোন্সের অনুরোধে তিন বছর পরিশ্রম করে জগন্নাথ হিন্দুদের 'ব্যবহার-শাস্ত্র বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচনা করে দেন। হিন্দুশাস্ত্রের নানা বিরুদ্ধ মতামতের ভেতরে সামঞ্জস্য বিধান করে এমন একটি সুষ্ঠু গ্রন্থ রচনা যে কত বড় শক্তির পরিচয় তা সাধারণ মানুষ কল্পনা করতে পারবেন না। সুপণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব গ্রন্থটি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একশ তেরো বছর বয়সে জগন্নাথের মৃত্যু হয়। তার কিছুকাল আগে থেকেই শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলা গদ্য ভাষার পুস্তক রচনা করতে আরম্ভ করেছেন।

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত মিশনারী উইলিয়াম কেরী ১৮১৮

খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্র দিগ্‌দর্শন প্রকাশ করেন। এই বছরই আরেকজন মিশনারী জোশুয়া মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলাদেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়ে পরে বন্ধ হয়ে যায়।

উইলিয়াম কেরী এদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ধর্মপ্রচার অপেক্ষা দেশী ভাষা শিক্ষা ও বিদ্যার অনুশীলনের জন্য তিনি আজও খ্যাতিমান। বাংলা কথ্য ভাষা শিক্ষার জন্য গ্রামে চাষী, মজুর, জেলে ইত্যাদি সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করতেন। তিনি বাংলা ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে ইতিহাস মালা, কথোপকথন উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষা শিক্ষার কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন মুনসী রামরাম বসু। ইনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য চরিত বলে একখানি পুস্তক রচনা করেন, এই গ্রন্থটিই বাংলা ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম গদ্য পুস্তক। এই পুস্তকের বিশেষ একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। উইলিয়াম কেরী ও রামরাম বসুর পুস্তক শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছিল। অবশ্য এর আগেই ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী সুপণ্ডিত স্যার চার্লস উইলকিন্স হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রথম ছাপাখানা সেইটিই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হুগলীর ইংরেজ কর্মচারী মিস্টার ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড্‌ প্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন। এটিও পূর্বোক্ত ছাপাখানাতেই মুদ্রিত হয়। তখন ছাপাখানায় বাংলা হরফ পাওয়া যেত না। হ্যালহেড্‌ সাহেব প্রাচীন বাংলা পুঁথি দেখে কাঠে খোদাই করে বাংলা হরফ তৈরী করার চেষ্টা করে সফল হন। এ কাজে হুগলী জেলার বড়া গ্রামের পঞ্চানন কর্মকার

সাহেবকে সাহায্য করেন। পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী কাঠের হরফ দিয়েই হ্যালহেড্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ ছাপা হয়।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্ভুক্ত গড় মান্দারণে অতি প্রাচীনকালে এক হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। জায়গাটির নাম ছিল বিধুর গড়। রাজার প্রাসাদ বা দুর্গের প্রাচীর ছিল চার পাঁচ মাইল বিস্তৃত। উচ্চতা ছিল বিশ থেকে ত্রিশ ফুট। দুর্গ মূল ছুঁয়ে দামোদর নদী যেত বয়ে। তখন গৌড়ের নবাব ছিলেন হুশেনশাহ। তাঁর সেনাপতি ইসমাইল গাজী গড়মান্দারণের হিন্দুরাজা গজপতিকে পরাজিত করে তাঁর দুর্গ ও প্রাসাদ বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু জয়ের সুখ তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। রাজা গজপতির সেনাপতি ভান্দসী রায় গাজী ইসমাইলকে ঘোড়াঘাট নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত করেন।

রাজা গজপতির দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আজও অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুপ্রসিদ্ধ দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে এই গড়মান্দারণের কথা লিখেছেন।

আকবরের প্রসিদ্ধ সভাসদ আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে লিখেছেন গড়মান্দারণের কাছেই হাজিয়া নামক স্থানে হীরা পাওয়া যেত।

গড়মান্দারণের খুব নিকটেই পশ্চিম পাড়ায় ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা খেলারাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান। শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গুর-এর প্রাচীন নাম সিংহপুর। এখানে খ্রীষ্টজন্মেরও বহু বৎসর পূর্বে সিংহবাহু বলে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহ মাত্র সাতশো অনুচর সহ বাঙালী শিল্পীর হাতে গড়া পাল-তোলা জাহাজে চড়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর তাম্রপর্ণী বা লঙ্কা দ্বীপে উপস্থিত হন।

সময়টা বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের বছর। বিজয়সিংহ লঙ্কা

অধিকার করে রাজকন্যা অনুরাধাকে বিবাহ করেন। বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপের নতুন রাজধানীর নাম রাখেন অনুরাধাপুর। কালক্রমে লঙ্কা দ্বীপের নামও পরিবর্তিত হয়ে হয় সিংহল। বিজয়সিংহের পিতার নামানুসারে তাঁর রাজ্যের নাম ছিল সিংহপুর। এই সিংহপুর থেকে কবি কালিদাস সিংহল গিয়েছিলেন। বর্তমান সিঙ্গুরের মাইল চারেক উত্তরে সিংহলপাঠান বলে একটা গ্রাম আছে। প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা পালার সঙ্গীত-রচয়িতা ভৈরব হালদারের বাড়ি ছিল সিঙ্গুরে।

হুগলী জেলার একটি বড় তীর্থস্থান তারকেশ্বর। এখানকার শৈব-মঠটি মাত্র শ-আড়াই বছর আগে উত্তর ভারত থেকে আগত শৈব-সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই শৈব-সন্ন্যাসীরা ছিলেন শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে সেই বিপর্যয়ের সুযোগে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে নানা জাতির সুযোগ-সন্ধানী মানুষ ছুটে আসে। বর্গীর অভিযানে বাংলাদেশের সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হয়। এই সময়েই মায়াগিরি বলে জনৈক শৈব-সন্ন্যাসী তারকেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

তারকেশ্বরকে লোক-সংস্কৃতির সমন্বয়ভূমি বলা চলে। তারকেশ্বরের শিবের আর এক নাম তারকনাথ। হুগলী জেলা এক সময় নাথধর্মের বড় প্রচার-কেন্দ্র ছিল। এই হুগলী জেলাতেই নাথধর্মের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র মহানাদে শিব, জটেশ্বরনাথ নাম ধারণ করে রয়েছেন। মোহন্তরা তারকেশ্বরে আসার আগে, গোপ জাতীয় মুকুন্দ ঘোষ ছিলেন শিবের পূজক। ইনি ছিলেন রাজা ভারামল্লের গো-পালক। গভীর অরণ্যে একদিন বোধ করি গরু চরাবার সময়ই মুকুন্দ একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। দেবতার আদেশে মুকুন্দ ঘোষ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে শিবের পূজারী হন।

মোহন্তদের আমলে ব্রাহ্মণ পূজারী এনে শিবের পূজার ব্যবস্থা

হয়। তবে লোকাচার ও সংস্কৃতিকে একেবারে নির্মূল করা কঠিন, তাই তারকেশ্বরের গাজনের পাঁচজন মূল সন্ন্যাসীর মধ্যে চারজনই গোপজাতীয়।

তারকেশ্বর মন্দিরে তারকনাথের পাশে বাসুদেব বিরাজ করছেন। দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালীর ছবিও রাখা হয়েছে।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব বাংলাদেশের একটি বড় উৎসব। তারকেশ্বরে চৈত্রের প্রথম থেকেই মেলা বসে। অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ তারকেশ্বরের মহাতীর্থে পায়ে হেঁটে আগে পুণ্য করতে আসতেন, আজও আসেন। নীলের বিরাট মেলায় হাতী নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। দক্ষিণ-রাঢ় অঞ্চলের নানা লোকানুষ্ঠানের এক মহামিলনের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে তারকেশ্বর।

তারকেশ্বরের কাছেই সুপ্রাচীন হরিপাল গ্রাম। প্রাচীন কিংবদন্তী বলে রাজা হরিপালের নাম থেকেই এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। রাজা হরিপালের সুন্দরী কন্যা কানড়াকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন গৌড়ের বৃদ্ধ রাজা। কানড়া সে প্রস্তাবে সম্মত হননি, তাই গৌড়ের সৈন্যবাহিনী হরিপাল রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু কানড়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে গৌড়-সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। ময়নাগড়ের মহাসামন্ত কর্ণসেনের পুত্র ধর্মমঙ্গল-খ্যাত মহাপরাক্রমশালী লাউসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

নাথধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলীর মহানাদ। প্রসিদ্ধ নাথ-যোগীদের ধর্মসাধনার সবচেয়ে বড় পীঠস্থানরূপে মহানাদের খ্যাতি একদিন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুটি শাখা-মঠও স্থাপিত হয়েছিল।

গুপ্তযুগেই শৈবধর্ম বাংলায় প্রবেশ করে। রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। তাঁর সমসাময়িক আসামের ভাস্করবর্মা কামরূপের তান্ত্রিকধারাকে এনে বাংলার শৈব-উপাসনার সঙ্গে যোগ করে দিলেন। হর্ষবর্ধন ও তাঁর পরবর্তী পালরাজাদের আমলে বৌদ্ধ

রীতিনীতির প্রভাব পড়ে শৈব-তান্ত্রিক মিলিত ধারার উপর। তার ফলেই বোধ করি বাংলায় নাথধর্মের বিকাশ ঘটে। নাথযোগীরা নাদ বা ধ্বনির সাধনা করেন। তাঁরা বলেন নাদেই এই জগৎ সংসার অধিষ্ঠিত। মহানাদে এখনও এই কিংবদন্তী প্রচলিত যে একদা এখানে এক মহাশঙ্খ থেকে মহানাদ উত্থিত হয়েছিল। তাই নাকি জায়গাটার নাম মহানাদ।

মহানাদের জটেশ্বরনাথের মন্দির বোধ করি সবচেয়ে প্রাচীন। এই মন্দিরের কাছেই ছিল নাথযোগীদের পাড়া। যোগীডাঙা বলে একটা গ্রাম আজও প্রাচীন কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নয়টি চূড়া বিশিষ্ট তিনতলা ব্রহ্মময়ী দেবীর মন্দিরও দ্রষ্টব্য। সারা মহানাদ জুড়ে নানা পুরাকীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন যুগে সমৃদ্ধ মহানাদ নানা আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। আজও যদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে খননকার্য চালান তবে অতীত বাংলার এক লুপ্ত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত হতে পারে।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বংশবাটি বা বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দির বাংলা দেশের স্থাপত্যশিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির ও মূর্তি-পরিকল্পনায় নাথধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাব আছে। বিগ্রহটি নিমকাঠের তৈরী। মন্দিরের গঠন ও কারুকার্য অপূর্ব। জনশ্রুতি বংশবাটির নীলকরদের অত্যাচার দেখেই নাকি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীলদর্পণ রচনা করেন।

হুগলীর আরেকটি বিখ্যাত গ্রাম দেবানন্দপুর। প্রাচীন সপ্তগ্রামের সাতটি গাঁয়ের মধ্যে এটি একটি। মুসলমান আমলে দেবানন্দপুর ছিল আরবী ফারসী শিক্ষার কেন্দ্র। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এখানে ফারসী পড়তে এসেছিলেন। বাংলা দেশের প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতার মাতুলালয় এখানে। এই গ্রামেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখার অনেক জায়গাতেই দেবানন্দপুরের কথা আছে। এখানে শরৎচন্দ্রের একটি

স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হয়েছে। প্রতি বছর বাংলা দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আসেন।

হুগলী জেলা বাংলাদেশের অনেক শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্মস্থান। আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রাম রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। আধুনিক ভারতবর্ষের তিনিই সবচেয়ে প্রগতিশীল মানুষ।

আর সকল যুগের সব সাধনার ধারাকে আত্মস্থ করে যিনি দেশ ও জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে গেছেন সেই রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঘটেছে কামারপুকুর গ্রামে। ভারতবর্ষের আর এক শ্রেষ্ঠ সন্তান পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন তখন বীরসিংহ ছিল হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত। হুগলীর জাহানাবাদ পরগণার (বর্তমানের আরামবাগ মহকুমা) মধ্যে প্রায় একই স্থানে রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের মত যুগ-প্রতিভার আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর।

বাংলাদেশের ঐশ্বর্যের লোভে ইউরোপীয় বণিকেরা দলে দলে এসে ঘাঁটি গড়েছিল ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলী জেলায়—পর্তুগীজেরা হুগলীতে, জার্মানরা ভদ্রেশ্বরে, গ্রীকরা রিষড়ায়, দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে, ফরাসীরা চন্দননগরে আর ডাচ বা ওলন্দাজেরা চুঁচুঁড়ায়।

বাদশাহ শাহজাহানের কাছ থেকে সনদ নিয়ে ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় বাণিজ্য কুঠি খোলে। একটা দুর্গও তারা এখানে তৈরী করে। ইংরেজরা চুঁচুড়া দখল করে সে দুর্গ ভেঙে ফেলে এক বিরাট ব্যারাক বাড়ি তৈরী করে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। বাংলা দেশে এইটিই বোধ করি সবচেয়ে বড় বাড়ি। এই বাড়িতে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের অফিস হয়েছে এখন। চুঁচুড়ার আর্মেনীয় গীর্জাটি বাংলা দেশের দ্বিতীয় গীর্জা বলে পরিচিত। জনৈক ফরাসী সৈনিক মঁসিয়ে পেরণ একটি বাড়ি তৈরী করান চুঁচুড়ায়। এই বৃহৎ বাড়িটি হাত

বদল হয়ে হুগলী মহসীন কলেজের জন্য ক্রয় করা হয়। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন।

হুগলী শহরের মধ্যে দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের স্মৃতি-ধন্য প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া ও মহসীনের সমাধি দর্শনীয় স্থান। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইমামবাড়ার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। কুড়ি বছর লাগে নির্মাণ কার্য শেষ হতে। তিন লাখ টাকার বেশী খরচ হয়েছিল।

হুগলী চুঁচুঁড়া এখন মিলিত শহর। বাংলাদেশের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি এখানকার অধিবাসী ছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য চরিত' রচয়িতা রামরাম বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, চুঁচুঁড়ায় বাস করতেন।

হুগলী জেলা বাংলাদেশের বহু কৃতী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম পাণিশেওলা গ্রামে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়এর জন্মস্থান গুপ্তিপাড়া। বিখ্যাত পণ্ডিত, বাগ্মী, সন্ন্যাসী ও রাজনীতিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পাণ্ডুয়ার কাছে খন্যান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের সংসারাশ্রমের নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য গোয়ালিয়র রাজ্যে গমন করেন। সেখান থেকে সিন্ধুদেশে যান এবং রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান-ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু হন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। ইংরাজ তাঁকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করেন, কিন্তু এই বীর সন্ন্যাসী অস্ত্রোপচারের কালে প্রাণত্যাগ করে বৃটিশ কারাগারকে ফাঁকি দেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, নাট্যকার গিরিশ ঘোষ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটা রয়েছে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে। ত্রিবেণীর কাছে 'কোনা' গ্রামে প্রখ্যাত ধর্মশীলা রাণী রাসমণির

জন্ম। এঁরই নির্মিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে বসে সাধনা করেছিলেন সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

আড়াইশো বছরের বেশী—চন্দননগর ছিল ফরাসী অধিকারে। জায়গাটাকে তাই ফরাসডাঙা নামেও অভিহিত করা হয়। সুতানুটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুরকে নিয়ে যেমন গড়ে উঠেছে কলিকাতা নগরী, তেমন বোড়কিশনপুর, খলিসানী আর গোন্দলপাড়া—এই তিনটি গ্রাম নিয়েই ফরাসীরা চন্দননগর শহরের পত্তন করেন।

শোভা সিং-এর বিদ্রোহের সময় চন্দননগরের ফরাসীরাও একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মদিনে চন্দননগর বিদেশী শাসনমুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চন্দননগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মাণিকতলা বোমার মামলা খ্যাত কানাইলাল দত্তের জন্মস্থান চন্দননগর। ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করে বাঙালী তরুণের ভীরু অপবাদ খণ্ডন করে গেছেন তিনি। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু যিনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরও শিক্ষা-দীক্ষা এখানে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী পি, এন ঠাকুর এই ছদ্মনামে জাহাজের টিকিট কেটে জাপানে পলাতক হন। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বাইরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর হাত থেকে সেই সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিপ্লবী মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সংঘ এখানে প্রতিষ্ঠিত। এঁরই কাছে পণ্ডিচেরী যাত্রার কিছু আগে শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছুকাল চন্দননগরের মোরাণ সাহেবের বাগানবাড়ীতে কাটিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজা রামমোহন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন পাল, মহাত্মা গান্ধী,

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেশব সেন, প্রমুখ মনীষীগণ নানা কাজে চন্দননগরে এসে বসবাস করে গেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ, আর বঙ্গদেশের হৃদ্ স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী জেলায়। কথাটি সর্বাংশে সত্য। কারণ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে এই জেলা থেকে যত অধিক সংখ্যক মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন তেমন আর অন্য কোন জেলা থেকে হন নি। এই জেলার ঐতিহাসিক স্থান ও ধর্মকেন্দ্রগুলিতে বাংলাদেশের অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

২

মেদিনীপুর

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জেলাটির বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে বিপ্লব আর বিদ্রোহের ঝড়। সে সব কথা বলার আগে জেলাটির কিছু ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া দরকার। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হাওড়া ও হুগলী জেলা। বিহার আর উড়িষ্যার কিছু অংশ পড়েছে পশ্চিম সীমায় আর উত্তর দিকে রয়েছে বাঁকুড়া।

মেদিনীপুরের উত্তরে রাঢ় অঞ্চলে পাথুরে শক্ত জমি। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমতল সরস মাটি। দক্ষিণ সীমা দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী বয়ে গেছে, আর পূর্ব সীমানা চিহ্নিত করে রূপনারায়ণ হুগলী নদীতে এসে মিশেছে। শিলাবতী, কংসাবতী, কালিঘাই আর রসুলপুরের নদী জালের মত জেলাটি ঘিরে বয়ে যাচ্ছে।

একদিন অরণ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল মেদিনীপুর। আবাদ করতে গিয়ে তার প্রায় সবটাই হাসিল করতে হয়েছে। তবু এখনও শাল, মহুয়া, পলাশের অরণ্য মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমান্তে কিছুটা বজায় আছে। আউশ, আমন ধান, আলু, পেঁয়াজ, পাটই মেদিনীপুরের প্রধান কৃষিসম্পদ। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় ফসলের পরিমাণ বেড়ে গেছে।

মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে গেছে দুটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাস্তা। প্রথমটা মেদিনীপুর-কেশপুর-ঘাটাল রোড। মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে পাণ্ডুয়ার যোগসাধন করেছিল এই রাস্তাটি। দ্বিতীয়টি তমলুক-পাঁশকুড়া-মেদিনীপুর রোড।

প্রাচীন ইতিকথায় দেখা যায় উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের যোগাযোগ অনেক দিনের। এই অঞ্চলটির অধিকার নিয়ে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে। এককালে উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দ হরিচন্দন ত্রিবেণী পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। তিনি ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ঘাটটি তৈরী করিয়ে দেন। তারপর বাংলার সুলতান সুলেমান কররাণীর পুত্র দায়ুদ খাঁ শুধু মেদিনীপুর অঞ্চল নয় উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত দখল করেন। মোগলদের সঙ্গে দায়ুদ খাঁর যুদ্ধের সময় আকবরের সেনাপতি টোডরমল্ল মেদিনীপুর দখল করেছিলেন। তখন মেদিনীপুর ছিল উড়িষ্যার অংশ।

মারাঠা বর্গীরা নবাব আলিবর্দীর আমলে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করায় দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলের মানুষেরা নানা দুঃখ দুর্দশা সহ্য করেছে। নবাব আলিবর্দী দেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন। তার ফলে উড়িষ্যা সুবাটিকে মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলাকে ছেড়ে দিতে হয়। বাংলার সীমা হয় সুবর্ণরেখা নদী। সেই সময় থেকে মেদিনীপুর স্থায়ীভাবে বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের নবাবী আমলে ইংরেজরা মেদিনীপুর বর্ধমান আর চট্টগ্রামের জমিদারী গ্রহণ করে। তারা কঠোরতার সঙ্গে খাজনা আদায় করতে আরম্ভ করে, আর বহু শতাব্দী ধরে মেদিনীপুরের জঙ্গল অঞ্চলে যে সব আদিবাসীরা জঙ্গলের অধিকার ভোগ করত তাদের উৎখাত করে। ফলে সেই আদিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহ করে। ইংরেজরা এই বিদ্রোহকে অসভ্য বর্বর চুয়াড়দের বিদ্রোহ নাম দেয়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা যে

নতুন ভূমি ব্যবস্থা সূচনা করে তার ফলে অনেক স্থানীয় পাইক তাদের অধিকার হারায়। তারাও বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহকে পাইক বা নায়েক বিদ্রোহ বলে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় চুয়াড়-বিদ্রোহীরা। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী আর বগড়ীর রাজা।

বিদেশী শাসকের কাছে মেদিনীপুর কোনদিন মাথা নত করেনি। তাই দেখা যায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সারা বাংলাদেশ যখন সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিঃশব্দ তখন মেদিনীপুরের পাইক চুয়াড়রা তাতে সাড়া দিয়েছিল। মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহী সত্তা নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী কালে স্বদেশীযুগে, অসহযোগ আর লবণ আইন ভঙ্গের আমলে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট বিপ্লবের আমলে তাই সম্ভব হয়েছিল কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার। অনেক শতাব্দীর আগে তমলুক অঞ্চলেই ছিল স্বাধীন তাম্রলিপ্ত রাজ্য।

যখন মেদিনীপুরে জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে তখন ইংরেজ বণিকেরা ষড়যন্ত্র করে মেদিনীপুরের রেশম, তসর, তুলা-শিল্প ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। ঘাটাল, কণ্টাই, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের মাহিষ্য সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিক্ষোভ ধূমায়িত হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ পায়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আমলে খাজনা বন্ধ আন্দোলন মেদিনীপুরে এমন সফল হয় যে জেলাটি সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের লবণ আইন ভঙ্গের আমলেও মেদিনীপুর পেছিয়ে থাকেনি। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্নও দেখতেন মেদিনীপুরের তরুণেরা। তাই মেদিনীপুরে কোন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁরা সহ্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। পেডী, বার্জ,

ডগলাসের মত দুর্ধর্ষ জেলা-শাসকগণ বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেন।

রাজনারায়ণ বসুকে বলা হত জাতীয়তার জনক। ইনি ছিলেন মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এঁরই প্রখ্যাত ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন বসু যিনি বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে গুলি করে আলীপুরের জেলে ফাঁসী যান।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম বীরসিংহ গ্রামে। বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়ে সারা দেশের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আপন ব্যয়ে জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও দুরূহ সংস্কৃতে কাব্যগ্রন্থ রচনা না করে সহজ সুন্দর মধুর বাংলা গদ্য সৃষ্টির দ্বারা বাংলা ভাষায় উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার পথ সুগম করে গেছেন।

সেকালের অনেক বিখ্যাত ইংরেজ বিশেষ করে বাংলার ছোটলাট তাঁর বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কখনো আপনার জাতীয় পোশাক ধুতি চাদর ছেড়ে কোট প্যান্ট পরেন নি। তাঁর পিতৃ-মাতৃভক্তির কাহিনীগুলি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। মায়ের কাছে কথা দিয়েছিলেন ভাইয়ের বিবাহে ঠিক সময়ে বাড়ী আসবেন। সাহেব কর্তা ছুটি দিতে না চাওয়ায় সরকারী চাকরি ছেড়ে দিতেও দ্বিধা করেন নি। অবশ্য শেষ অবধি তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। তখন তিনি মায়ের সঙ্গে যথাসময়ে দেখা করার জন্য সাঁতার দিয়ে দামোদর নদ পার হয়েছিলেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন কঠোর, কিন্তু দুঃখী মানুষের জন্য সারাজীবন চোখের জল ফেলে গেছেন।

গরীবের ঘরে জন্মেছিলেন বটে কিন্তু অগাধ বিদ্যা, শ্রম ও সততাগুণে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। সে সব অর্থ দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করে গেছেন।

তেজ ও পৌরুষ মেদিনীপুরের আর একজন ত্যাগব্রতী মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ইনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রখ্যাত কর্মী মাহিষ্যকুলরত্ন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। মেদিনীপুরের খাজনাবন্ধ আন্দোলন এঁরই পরিচালনায় সফল হয়ে সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মী।

মেদিনীপুরের বীরকন্যারাও বিপ্লবী আন্দোলনে পেছিয়ে থাকেননি কোনদিন। একদিন কর্ণগড়ের রাণী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বন্দী হয়েছিলেন। আধুনিককালে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট বিপ্লবের অগ্নিঝরা দিনে মেদিনীপুরের বিপ্লব-নায়িকা মাতঙ্গিনী হাজরা—গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণী মুখে নিয়ে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন মেদিনীপুরের বুকে। ইংরেজ পুলিসের গুলিতে দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, তবু পতাকা-দণ্ড শেষ অবধি ধরে ছিলেন অকুতোভয়ে। ভারতবর্ষ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় প্রতি বছর ৯ই আগষ্টে।

ক্ষুদিরাম বসু মেদিনীপুরের সন্তান। অত্যাচারী বিচারক কিংস ফোর্ডকে বোমা মারতে গিয়ে মজঃফরপুরে এঁর ফাঁসী হয়। সারা ভারতবর্ষ এই অগ্নিশিশুর উদ্দেশ্যে আজও শ্রদ্ধা জানায়। বিয়াল্লিশ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি আজ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

একটি কাহিনী ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিং-এর নামে প্রচলিত আছে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে শোভা সিং-এর বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু এ বিদ্রোহের পিছনে কোন আদর্শ বা দেশপ্রেম ছিল না। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর হাতে গড়া মারাঠা বাহিনীর কাছে বার বার পরাজিত হচ্ছেন। ভারতবর্ষের চারিদিকেই তখন বিশৃঙ্খলা। সে সুযোগে যে সব সামন্ত বা জমিদার রাজ্য লোভে মাথা তুলতে আরম্ভ করেন শোভা সিং তাদেরই একজন। বাংলার সুবেদার

ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন বৃদ্ধ। তার উপর ফারসী কবিতার বয়েৎ আওড়ে তাঁর দিন কাটত। উদ্ধত জমিদার বা সামন্তদের শায়েস্তা করার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল না।

বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের উপর ভার ছিল বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের। শোভা সিং-এর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি নিহত হলেন। শোভা সিং বর্ধমান শহর দখল করে রাজা কৃষ্ণরামের ধনসম্পত্তি শুধু লুঠ করে ক্ষান্ত হলেন না তাঁর স্ত্রী কন্যাকে বন্দী করলেন। বর্ধমানরাজকে পরাজিত করে শোভা সিং-এর প্রতাপ গেল বেড়ে। তিনি সৈন্যবাহিনী নূতন করে সংগঠিত করলেন। জমিদারীর সীমাও তাঁর দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে গেল। গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরের লোক তাঁর দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠল। অবিরাম লুঠপাট চালিয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়ে শোভা সিং রাজা উপাধি গ্রহণ করলেন। তাঁর রাজ্যটিও বড় কম নয়, প্রায় দুশো মাইল লম্বা।

কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায় ঢাকায় গিয়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে শোভা সিং-এর বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ ব্যাপারটায় তত গুরুত্ব দিলেন না। পরে যখন শোভা সিং-এর লুঠপাটের বিবরণ ভালভাবে পেলেন তখন হুগলীর ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে হুকুম দিলেন শোভা সিংকে দমন করতে।

নুরুল্লা খাঁ, শোভা সিংকে দমন করবেন কি শোভা সিং-ই নুরুল্লা খাঁকে হুগলী দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। পরে সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে নুরুল্লা খাঁ দুর্গ ছেড়ে পালালেন। হুগলী দুর্গ শোভা সিং-এর দখলে গেল। শোভা সিং-এর অত্যাচারে স্থানীয় অধিবাসীরা উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের অনুরোধ করলেন শোভা সিং-কে শায়েস্তা করতে। ওলন্দাজ বণিকেরা এক যুদ্ধ জাহাজে তিনশ সৈন্য পাঠালেন। জাহাজ থেকে কামানের গোলা দাগতে শুরু করতেই ভীত শোভা সিং-এর সৈন্যরা দুর্গ ছেড়ে পালাল। কিন্তু শোভা সিং-এর দৌরাত্ম্য তাতে

কমল না। কারণ উড়িষ্যার পাঠান রহিম খাঁ ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মিলিত অত্যাচারে যখন সাধারণ মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে, তখন এক বিচিত্র ব্যাপারে শোভা সিং-এর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

আগেই বলা হয়েছে বর্ধমানরাজের স্ত্রী-কন্যাকে শোভা সিং বন্দী করেছিলেন। পরে রাজকন্যার ছুরিকাঘাতে এই দুর্বৃত্তের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাটিকে কল্পনার রঙ মাখিয়ে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন।

শোভা সিং-এর দৌরাত্ম্যে যখন পশ্চিম বাংলার গঙ্গাতীরের অধিবাসীরা ব্যতিব্যস্ত তখন নিঃশব্দে বিদেশী বণিকেরা বিশেষ করে ইংরেজ বণিকেরা এদেশের মাটিতে তাদের শিকড় গাড়বার জন্য অবিরত চেষ্টা করে চলেছে। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগল ফৌজদার আবদুল গণি হুগলীর ইংরেজ কুঠি জ্বালিয়ে দেন। তখন জব চার্ণকের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যরা গঙ্গার পূর্বতীরে সুতানুটিতে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা তাড়া খেয়ে জাহাজে করে হুগলী নদী ধরে আরো দক্ষিণদিকে পালিয়ে এসে হিজলীতে আশ্রয় নেয়। জায়গাটি রসুলপুরের নদী আর হুগলী নদীর সঙ্গমস্থল।

পলাতক ইংরেজরা হিজলীর কাছে খেজুরীতে একটি নৌবন্দর গড়ে তোলে। এজেন্ট হাউস, পোর্ট হাউসও স্থাপিত হয়। নাবিকদের বিশ্রামের জন্য হোটেল তৈরী হয়। বন্দর নগর খেজুরী টাউনরূপে গড়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে বাংলার সুবাদার সায়েস্তা খাঁর অনুমতি নিয়ে জব চার্ণক আবার গঙ্গার পূর্ব উপকূলে সুতানুটি গ্রামে ফিরে আসেন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে।

মেদিনীপুরের হিজলী অঞ্চলে প্রচুর হিজল গাছ ছিল। তাই জায়গাটার নাম হিজলী। এই হিজলীর স্রষ্টা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার তৈরী মসজিদ আজও জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। একদিন এই মসজিদের আলো দেখে সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকেরা

পথ ঠিক করতেন। আজও ভিক্ষুক ও ফকিরেরা মসনদ-ই-আলার মসলন্দী গীত গেয়ে বেড়ান। হিজলীর বন্দীশালায় কাপুরুষ ইংরেজ সৈন্যরা নিরস্ত্র বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে গুলি করে মারে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রকাশ্য জনসভায় সেই ঘৃণ্য বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

একদিন মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত রাজ্যের খ্যাতি সুদূর যবদ্বীপ ও চীনদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আরো সুপ্রাচীনকালে পৌরাণিক যুগেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্বে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে লেখা গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমীর গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। অনেকে বলেন জৈনধর্মের তাম্রলিপ্তি শাখার নাম থেকে তাম্রলিপ্তের নামকরণ হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের তাম্রধ্বজ রাজার নাম থেকেই তাম্রলিপ্তের নাম করণ হয়েছে। বর্গভীমার বিখ্যাত বিগ্রহটি এঁরই প্রতিষ্ঠিত।

সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের রাজত্বকালে সুদূর চীনদেশ থেকে পরিব্রাজক হুয়েন সাং এসেছিলেন বাংলাদেশে। তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধমঠে তিনি দু'বছর বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী তাম্রলিপ্ত ছিল সে আমলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দর থেকেই বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপের উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। সিংহল, যবদ্বীপ আর চীনদেশের উদ্দেশ্যে বাঙালী বণিকগণ বাণিজ্য করতে যেতেন এই বন্দর থেকেই। গ্রীস ও রোমের সঙ্গেও তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সেদিনকার গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করেই কবি সত্যেন দত্ত লিখেছেন :

বাংলার মস্‌লীন
বোগদাদ রোমচীন
কাঞ্চন তৌলেই
কিনতেন একদিন।

আর সেই মসলীন তাম্রলিপ্তের (পরে সপ্তগ্রামের) বন্দর থেকেই জাহাজযোগে রপ্তানী হত। কথিত আছে ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করতেন। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মাহিষ্যগণ তাম্রলিপ্ত অধিকার করেন। আজ তমলুক ইতিহাসের প্রাচীন স্মৃতি ধারণ করে পড়ে আছে।

মেদিনীপুরের সুবিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবনাত ঘটলে হিজলীতে নতুন বন্দর গড়ে ওঠে। সে হিজলীও আজ ইতিহাসের স্মৃতিমাত্র। এখন হিজলী নদীর তীরবর্তী হলদিয়াতে যে বিরাট সমুদ্র বন্দর তৈরী হচ্ছে তা তাম্রলিপ্তের পূর্ব গৌরবকে ফিরিয়ে আনবে আশা করা যায়।

মেদিনীপুরের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মেদিনীপুরের মাটির তলা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। ঝাটিবনী শিলদার কাছে তামাজুড়ী গ্রামে পাওয়া গেছে তাম্রযুগের মানুষদের ব্যবহৃত তামার তৈরী অস্ত্র।

এই দেখে মনে হয় বহু প্রাচীন কাল থেকেই মেদিনীপুরের মাটিতে মানুষের বসবাস ছিল। পরবর্তীকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে দুটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা এসে মেদিনীপুরের মধ্যে মিশেছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির ধারা তো ছিলই। তাই দেখা যায় ঝাড়গ্রামের টুসু উৎসব আর ভাওয়াইয়া গানের আসরের পাশাপাশি—দেবাসুরের যুদ্ধের পৌরাণিক ইন্দ্রধ্বজের উৎসব আজও চলে আসছে।

জৈন আর বৌদ্ধধর্ম একদিন মেদিনীপুরে প্রবেশ করেছিল। চন্দ্রকোণা গ্রামের ধর্মপূজার ধূম দেখে তাই মনে হয়। ঘাটালের ধর্মরাজ কূর্মমূর্তি ধারণ করে আছেন। তবে এসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় ধর্মঠাকুর ধীরে ধীরে হিন্দু দেবতা শিবের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান। ঝাড়গ্রামের সাঁওতালদের পৌষ মাসে ধানকাটা ঝাড়ার পরবের নাম সোহরায় পরব। এই পরবের মধ্যে গো-উৎসবটি বেশ লক্ষ্য করার মত; কারণ এই উৎসবটি ঝাড়গ্রামের সব লোক-উৎসবের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

ঝাড়গ্রামের বিখ্যাত বাঁধনা পরব দেখলেই বোঝা যায় কেমন করে সাঁওতালী উৎসবটি সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছে। কালীপূজার পর তিনদিন ধরে চলে এই উৎসব। সাঁওতালী গো-উৎসবে গরুকে দিয়ে ডিম ভাঙানো হয়। এতে নাকি বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাঁধনা পরব উপলক্ষেও গরুকে দিয়ে ডিম ভাঙানো হয়। সাঁওতালরা ছাড়া মুণ্ডা, কোড়া প্রভৃতি উপজাতিদেরও বাস মেদিনীপুরে।

মেদিনীপুরের লোধাজাতি—ইংরেজের কাছে স্বভাব-দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু লোধারা নিজেদের চিরস্বাধীন অরণ্যচারী শবর বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করে।

প্রাচীন শবরদের মত এরাও শিকারপ্রিয়। এদের উপাধিগুলিও বিচিত্র। নায়েক, সর্দার, কোটাল, ভুঁইঞা প্রভৃতি উপাধি দেখে মনে হয় এরাও একদিন সামাজিক জীবন যাপন করত, কারণ এখনও তাদের সমাজ রয়েছে, রয়েছে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম। এদের সমাজের মোড়লকে বলা হয় মুখিয়া।

চন্দ্রকোণার দেবমন্দিরগুলিতে বাঙালী শিল্পীরা উড়িষ্যার স্থাপত্য-রীতিকে আত্মসাৎ করেছেন। তাঁরা বাংলার চৌচালা আর আটচালা-রীতিকে বজায় রেখে উড়িষ্যার রেখদেউলের পঞ্চরত্নটি মাত্র গ্রহণ করেছিলেন। গড়বেতার কানেশ্বর ও দাঁতনের শ্যামশেখর মন্দিরে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের ছাপ আছে। চন্দ্রকোণার লালজীর মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দির। তবে মেদিনীপুর শহরে নাড়াজোল-রাজ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুপুরী স্থাপত্যের প্রভাব আছে।

জেলার প্রধান শহর মেদিনীপুরের নাম পাওয়া যায় আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরগ্রন্থে। তাতে মেদিনীপুরকে 'প্রকাণ্ড নগর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব পদব্রজে উড়িষ্যা যাবার পথে মেদিনীপুরে এসেছিলেন। সমুদ্র তীরবর্তী শহর কাঁথি এককালে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে বিখ্যাত ছিল। কাঁথির কাছেই দীঘা একটি ছোট্ট গ্রাম। দীঘার সমুদ্র-সৈকত দেশ-বিদেশের সৌন্দর্য-পিপাসু পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে। পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচেষ্টায় এখানে একটা সমুদ্র আবাস তৈরী হয়েছে। এখানকার সমুদ্র অনেকটা শান্ত; পুরীর সমুদ্রের মত সদাই উর্মি-চঞ্চল নয়। দীঘার সমুদ্র-সৈকতের ঝাউবন সত্যই মনোমুগ্ধকর। দীঘার বালুকা-বেলা জমাট বাঁধা সিমেন্টের মত শক্ত, এখানে এরোপ্লেন নামতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি আছে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের। জায়গাটা স্বাস্থ্যকরও।

ঘাটাল মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার সুতি ও তসরের কাপড়, কাঁসার বাসন ও মাটির জিনিসের প্রসিদ্ধি আছে।

খড়গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্নোলজী ভারত বিখ্যাত। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল কাউখালিতে গত শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লাইট হাউস। আজও তা সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে অন্ধকারে পথের নিশানা দেয়।

স্বাধীনতা লাভের পর মেদিনীপুর দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। জেলাটি শুধু বিপ্লবভূমিই নয় সাংস্কৃতিক সাধনার পাদপীঠও। সারা বাংলার তারুণ্যশক্তি জেলাটির উদ্দেশ্যে জানায় সশ্রদ্ধ প্রণতি।

৩



বর্ধমান

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান রাঢ়দেশে এসেছিলেন। রাঢ়দেশের যে অঞ্চলে বর্ধমান পরিভ্রমণ করেন বোধ করি সেই অঞ্চলের নামই হয়েছে বর্ধমান। রাঢ়দেশের লোকেরা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। এই বর্ধমান জেলার আদিবাসী বাউরীদের টোটেম কুকুর। জৈন তীর্থঙ্করদের অনেক রকম মূর্তি রাঢ় অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। মনে হয় জৈন-সন্ন্যাসীরা প্রাচীন রাঢ়দেশের রুক্ষ রূঢ় মানুষদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য এ অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচার করেন।

জেলাটির উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ, পূর্ব দিকে নদীয়া, দক্ষিণ দিকে হুগলী, এবং বাঁকুড়া আর পশ্চিম দিকে মানভূম। প্রাচীন রাঢ়ভূমির একেবারে মধ্যস্থলে জেলাটি রয়েছে। তাই এখানকার মাটির রঙ লাল। সে মাটিতে কাঁকর আর লাল বালি মেশানো। প্রাচীন পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে জেলাটি অবস্থিত। বর্ধমানের পশ্চিম দিকের প্রায় সবটা আর পূর্ব দিকের খানিকটা অঞ্চল বেশ উঁচু। জেলাটির মাঝে মাঝে জলাভূমিও আছে, আর আছে শালবন।

বর্ধমানের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী নদী, উত্তর দিকে অজয় নদ, বীরভূম আর বর্ধমানের সীমানা নির্দেশ করে গিয়ে পড়েছে

ভাগীরথীতে। দুরন্ত দামোদর, বর্ধমান আর বাঁকুড়াকে আলাদা করে দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথীর দিকে। দামোদর নদের দুটি শাখা নুনিয়া আর সিঙ্গারান। এ ছাড়া ব্রাহ্মণী, তামলা বাবলা, কানা আর ধলকিশোর জেলাটির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এগুলি সব পাহাড়ে নদী। এগুলি বর্ষায় জলে ভরে থাকে কিন্তু চাষের সময় এদের কাছে জল পাওয়া যায় না। তাই সেচের ব্যবস্থা হয়েছে ইডেন খাল কেটে। সম্প্রতি দুর্গাপুরের কাছে বাঁধ দেওয়ার ফলে কানা আর দামোদরের স্রোত সারা বছর বইছে। চাষেরও হয়েছে সুবিধা। এ জেলায় তিন জাতের ধানই ভাল জন্মায়। বালি মেশানো লাল মাটিতে আখের চাষ ভালই হয়। আলু ও পাট বর্ধমানে উৎপন্ন হয় প্রচুর।

জেলাটির প্রধান খনিজ দ্রব্য হল কয়লা। রানীগঞ্জ অঞ্চলকে বলা হয় কয়লার রাজধানী। এখানে লোহা পাথরও পাওয়া যায়। লোহা আর কয়লার সুবিধা আছে বলে আসানসোল-রাণীগঞ্জ বাংলাদেশের সেরা শিল্পাঞ্চল রূপে গড়ে উঠেছে।

বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসও উপেক্ষার নয়। মশাগ্রাম থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙালী রাজা শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল বর্ধমান। পালযুগ বর্ধমানের সমৃদ্ধির যুগ। অনেকে অনুমান করেন পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল রাঢ়ভূমির সন্তান। সেন রাজাদের আমল পার হয়ে যখন মুসলমান যুগ এল, তখন বর্ধমান এক উল্লেখযোগ্য স্থান হয়ে উঠল।

মোগল সৈন্যের সেনাপতি টোডরমল পাঠান সুলতান দাউদ কররাণীকে বাংলা দেশ থেকে উড়িষ্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পথে বর্ধমানে ঘাঁটি তৈরী করেন। সময়টা যোড়শ শতকের শেষের দিকে। এর পর বর্ধমান শহরের দিকে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি পড়ে। জাহাঙ্গীর বিবাহ করতে চেয়েছিলেন পরমাসুন্দরী নূরজাহানকে। কিন্তু আকবর বাদশাহ শের আফগান নামে এক

সেনা নায়কের সঙ্গে নূরজাহানের বিবাহ দিয়ে তাঁদের দুজনকে দিল্লী থেকে অনেক দূরের দেশ পশ্চিমবাংলার বর্ধমানে পাঠিয়ে দেন।

এর পর আকবরের মৃত্যু হল। দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন জাহাঙ্গীর। বাংলার সুবাদার তখন মানসিংহ। মানসিংহকে সরিয়ে কুতবুদ্দিন খাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন জাহাঙ্গীর। কুতবুদ্দিন খাঁ জানতেন জাহাঙ্গীরের অভিপ্রায়। তাই শের আফগানকে হত্যা করার জন্য নানা চক্রান্ত করলেন। কিন্তু শের খাঁর বুদ্ধি কৌশলের কাছে পরাস্ত হলেন। তখন কুতবুদ্দিন খাঁ আর শের খাঁর মধ্যে মুখোমুখি তলোয়ারের লড়াই হল। সে লড়াইয়ে কুতবুদ্দিনের তলোয়ারের আঘাতে শের আফগান সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েও আপন তরবারির অগ্রভাগ কুতবুদ্দিনের বুকে ঢুকিয়ে দিলেন। দুজনেই ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। পাশাপাশি দুজনকে কবর দেওয়া হল। সে কবর দুটি আজও আছে বাঁকা নদীর কাছে। এর পর জাহাঙ্গীর বর্ধমান থেকে নূরজাহানকে নিয়ে গেলেন দিল্লী। সামান্য জায়গীরদারের পত্নী হলেন ভারত-সম্রাজ্ঞী।

বর্ধমান শহরের বুকের ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে যায়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বর্ধমানে এসে আশ্রয় নেন। দখল করে নেন বর্ধমান শহর।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, পৌত্র আজিমুশ্বানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী! তা সত্ত্বেও আজিমুশ্বান বর্ধমানকে দ্বিতীয় রাজধানী বানিয়ে প্রায় তিন বছর এখানে বসবাস করেন।

এঁর কাছে ১৬০০০ টাকা নজরানা দিয়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা নামে তিনখানা গ্রামের স্বত্ব স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে ইংরেজ বণিকেরা কিনে নেন।

বর্ধমানকে কেন্দ্র করে আরেকটি বিচিত্র নাটক জমে উঠেছে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে। নবাব আলিবর্দী তখন বাংলার

নবাব। তিনি আরামবাগে বসে শুনলেন দুর্ধর্ষ মারাঠা বর্গীর দল ঝড়ের মত ছুটে আসছে বাংলার দিকে। আলিবর্দ্দী সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমান শহরে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন বর্গীদের অপেক্ষায়। কিন্তু এর পরে যা ঘটলো তা বড়ই চমকপ্রদ। মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনী বর্ধমান শহর ঘেরাও করে আলিবর্দ্দীকে বন্দী করে ফেলে। এক সপ্তাহ অবরুদ্ধ থেকে মরিয়া হয়ে আলিবর্দ্দী বর্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতে করতে কাটোয়া পৌছান। সেখান থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। তখন ক্ষিপ্ত বর্গীরা বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথের ধারে গ্রামগুলোতে যে অত্যাচার করে তা বহুদিন পর্যন্ত বাঙালীকে আতঙ্কিত করে রেখেছিল। আজও যখন বাংলাদেশের দুরন্ত ছেলেরা ঘুমাতে চায় না—তাদের মা-রা তখন বর্গীর ভয় দেখিয়ে তাদের ঘুমপাড়াবার ছড়াটি গেয়ে থাকেন। ছড়াটি এই—

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

বর্ধমান অঞ্চলের মাটির তলা থেকে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক নিদর্শন বেরিয়ে এসেছে। সুপ্রাচীন যুগের শিকারীদের তৈরী পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দুর্গাপুর অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ এই দুর্গাপুরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিখ্যাত ইস্পাত কারখানা। দুর্গাপুর এখন পশ্চিমবঙ্গের একটি সমৃদ্ধ শিল্পনগরী। বার্ণপুরের কারখানাটির খ্যাতিও দেশব্যাপী।

বর্ধমান জেলার সাংস্কৃতিক সাধনার ধারাটি সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত। বাংলার বিখ্যাত শক্তিসাধক কমলাকান্তের উপাস্য দেবী ও উপাসনার স্থান আজও রয়েছে বর্ধমানে। বাংলার শক্তিসাধনার দু'জন চারণ কবির একজন হালিশহরের রামপ্রসাদ আর একজন বর্ধমানের কমলাকান্ত। কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পুঁথির বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে বর্ধমান

নগরের উল্লেখ আছে। কবি ভারতচন্দ্র বর্ধমানের ছয়টি গড়ের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। আর নগরের যে সমাজচিত্র দিয়েছেন তাও অপূর্ব।

আজ কোথায় নূরজাহান, কোথায় শের আফগান, তাঁদের প্রাসাদ গুলবাগিচা সবই অবলুপ্ত। শুধু শহরের প্রান্তে সাধক জয়পাল আর পীর বহরমের স্মৃতিচিহ্ন সেকালের হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পীর বহরম দিল্লী থেকে বাংলা দেশে এসে বর্ধমানে আশ্রয় নেন। বর্ধমানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সাধু জয়পালের। তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এর কিছুদিন পরেই পীর বহরমের মৃত্যু হয়। এই দুই সাধকের নাম আজও হিন্দু মুসলমান উভয়ে ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই ঘোষের—দুর্গ ও গড় ছিল অজয় নদের ধারে। জায়গাটা এখন ঢেকুরগড় বলে পরিচিত। ঢেকুরগড়ের আর একটি স্থানীয় নাম ত্রিষষ্ঠিগড়। প্রাচীনকালে ঢেকারু বলে একটি জাতি ছিল, তারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করত। এখনও তাদের অস্তিত্ব আছে। বোধ করি তাদের নাম থেকেই ঢেকুর নামটি এসেছে। কাছেই গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের বিখ্যাত দেউল এখনও আছে। গৌড়েশ্বরের মহাসামন্ত কর্ণসেন এঁর কাছে পরাজিত হন। পরে কর্ণসেনের পরাক্রান্ত পুত্র লাউসেন 'ধর্মের' সহায়তায় এঁকে পরাভূত করেন।

চৈতন্যযুগে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে শান্তিপুরের সঙ্গে কালনার নামও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ সেই মুসলমান প্রাধান্যের যুগে তাঁদের পার্ষদগণ সহ কালনায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন।

মুসলমান যুগে কালনার সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। হুসেনশাহের পৌত্র ফিরোজশাহ মসজিদ-ই-জামিয়া বলে এক সুবৃহৎ মসজিদ

এখানে নির্মাণ করেন। এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসতেন কালনা শহরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ।

বর্ধমানের আর একটি বিখ্যাত গ্রাম শ্রীপাট দেন্নুড়। এই গ্রামে বাস করতেন চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস। কুমার-হট্ট—হালিশহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের কাছে মামগাছি গ্রামেও কিছুদিন তিনি বাস করেছিলেন। তারপর তিনি আসেন দেন্নুড়। এই গ্রামে বসেই তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতীও বাস করতেন দেন্নুড়ে। কেশবভারতীর আদি বাসস্থান ছিল নবদ্বীপের কাছে ফুলিয়া গ্রামে। তবে বেশীর ভাগ সময় বর্ধমানের কাটোয়াতেই তিনি অতিবাহিত করেন।

বর্ধমানের কোগ্রাম একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন গ্রাম। এটি মঙ্গলকাব্য-খ্যাত উজানীনগরের একাংশ মাত্র। অজয় নদ ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে উজানীনগরের বন্দর থেকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর সমুদ্র পার হয়ে সুদূর সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন বাণিজ্য করতে।

মনসামঙ্গল-কাব্যের চাঁদ সওদাগর তাঁর পুত্র লখিন্দরের বিবাহ দিয়েছিলেন উজানীনগরের কন্যা বেহুলার সঙ্গে। বাংলা দেশের বণিক সম্প্রদায় যে এককালে সমাজে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন তা মঙ্গলকাব্য পড়লেই বোঝা যায়। বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ছিল এদের সমৃদ্ধিশালী সমাজ। এই বণিক সমাজের ইতিহাস বাদ দিয়ে বাংলার সামাজিক ইতিহাস লেখা বোধ করি সম্ভব নয়।

চৈতন্যমঙ্গল-কাব্যের প্রখ্যাত কবি লোচনদাসের জন্মস্থান কোগ্রাম। চৈতন্যচরিত রচনা করে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে লোচনদাসের একটা বিশেষ স্থান আছে। ভক্তকবি লোচন দাসের পাট আজও কোগ্রামে আছে—তাঁর সমাধিমন্দিরও সেখানে

আছে। প্রতি বৎসর কোগ্রামে উৎসবের সময় অনেক বৈষ্ণব, বাউল লোচনদাসের পাটে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে যান।

আধুনিক কালে বাংলা দেশের পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নিবাসও অজয় তীরের কোগ্রাম। শহরের টানে এই পল্লীপ্রাণ কবি গ্রাম ছেড়ে আজও যাননি।

বর্ধমানের কণ্টকনগর বা কাটোয়া বাঙালীর সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলা দেশে তখন ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত বয়ে চলেছে। সে স্রোতকে রোধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। এখানে শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্নাসী সম্প্রদায়ের কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কেশব ভারতী তাঁকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দেন। কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর গ্রামে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সুবিখ্যাত লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের বিখ্যাত লোককবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পৈত্রিক ভিটা ও জন্মস্থান বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে।

অত্যাচারে কবি পূর্বপুরুষের গ্রাম দামুন্যা ত্যাগ করে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে প্রায় নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় দামোদর নদ আর শিলাই নদী পার হয়ে মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামে আশ্রয় নেন। এখানকার ব্রাহ্মণ-জমিদার বাঁকুড়া রায় তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই রঘুনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তিনি চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচনা করেন।

মধ্যযুগের অন্যান্য জমিদারদের মত বর্ধমানের রাজাদের দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতি আছে। বর্ধমানের অনেক পথঘাট তাঁরাই নির্মাণ করে দিয়েছেন। অনেক দীঘি, পুষ্করিণী কাটিয়ে দিয়েছেন। বর্ধমানের গ্রামে ও শহরে দেবালয় তৈরী করে দেব-দেবী প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। অম্বিকা-কালনাতেও তাঁদের তৈরী দেবালয়ের অভাব নেই। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির।

ধর্ম ঠাকুরকে শিবঠাকুর কেমন আশ্চর্য কৌশলে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন, তার বিচিত্র দৃষ্টান্ত জামালপুরের বুড়োরাজ। ধর্ম-রাজ্যের রাজ আর বুড়োশিবের বুড়ো নিয়ে বুড়োরাজ মূর্তি পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে।

বর্ধমানের সংস্কৃতি অতি সুপ্রাচীন। গোপবংশীয় রাজারা একদিন রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁরা ছিলেন শিবের উপাসক। অবশ্য বর্ধমানে শিবের পূজাও যেমন হয় তেমনি গ্রামে গ্রামে ধর্মঠাকুরেরও অভাব নেই। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বেড়েছে।

বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। অনেকে বলেন এঁরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছেন। কিন্তু মনে হয় কথাটা ঠিক নয়। এঁরা খাঁটি বাঙালী, প্রথমে এঁরা ছিলেন সদ্‌গোপদের মতই কৃষিজীবি। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁদের মধ্যে শৌর্য-বীর্যের বিকাশ ঘটে। রাঢ়ের সাংস্কৃতিক জীবনে উগ্রক্ষত্রিয় ও সদ্‌গোপদের দান অপরিসীম।

বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এঁরা ছিলেন শক্তির উপাসক। আজও বর্ধমানের অনেক গ্রামে এঁদের পূজিত চণ্ডী, চামুণ্ডা কিংবা মহিষমর্দিনীর মূর্তি দেখা যায়। বর্ধমানে ব্যগ্রক্ষত্রিয়দেরও প্রাধান্য কম নয়। বাংলার ইতিহাস সাহিত্য ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের দানে সমৃদ্ধ। বর্ধমানের ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাউরী প্রভৃতিদের মধ্যে মনসা দেবী ও চণ্ডী দেবীর প্রতিপত্তি খুব বেশী।

মনসামঙ্গল পুঁথির শ্রেষ্ঠ লেখকদের বেশীর ভাগই রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী। মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতা ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে যে সব গ্রামের উল্লেখ আছে তার বেশীর ভাগ বর্ধমানে অবস্থিত। মনসামঙ্গলের অধিকাংশ লেখকের জন্মস্থান রাঢ় অঞ্চলে।* বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত

রঘুনাথ শিরোমণির জন্ম মানকর। বাল্যকাল থেকে রঘুনাথ ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান।

মানকর অঞ্চলে তাঁর বুদ্ধির সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই: একবার পাঠশালার গুরুমহাশয়ের আদেশে গুরুপত্নীর কাছ থেকে তামাকের জন্য আগুন আনতে যান। গুরুপত্নী চিমটায় করে জ্বলন্ত অঙ্গার আনলে রঘুনাথ দুহাত ভরে ধূলো নিয়ে গুরুপত্নীকে তার উপর আগুন দিতে বলেন।

আধুনিক কালে কালনার খ্যাতির কারণ পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজের ইনি ছিলেন প্রখ্যাত ছাত্র। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাঙালীর সামনে এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত বৃত্তিভোগ করা বা চাকরি করাকে ইনি ঘৃণা করতেন। কালনায় টোল খুলে ইনি ছাত্রদের আপন গৃহে রেখে বিদ্যা দান করতেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসাও শুরু করেন। বিলাতী সুতো কিনে দেশী তাঁতীদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে সেই কাপড় হাটে বাজারে বিক্রি করতেন। দেখতে দেখতে তাঁর ব্যবসা জেঁকে ওঠে। তিনি বাংলা দেশের বাইরে কানপুর, মথুরা প্রভৃতি জায়গায় কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেন। কাশী, অমৃতসর থেকে শাল এনে বাংলা দেশে বিক্রয় করতেন। বীরভূম জেলায় দশ হাজার বিঘা জমি কিনে চাষ আরম্ভ করেন। পাঁচশ গরু কিনে ঘিয়ের ব্যবসাও শুরু করেন। কাঠের ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধির কাছে কলকাতার বনেদী বণিক শীল মল্লিক লাহারাও হার মেনেছিলেন। তারানাথ বাচস্পতির আরও একটা পরিচয় ছিল। তিনি যথার্থ প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন।

বেথুন সাহেব যখন বালিকা বিদ্যালয় খুলে ছাত্রী খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন তারানাথ বাচস্পতি তাঁর কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে বেথুন

সাহেবের স্কুলে ভর্তি করে দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ ব্যাপারে বিতর্কে নামেন তখন তারানাথ শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরবর্তীকালে বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য যখন আন্দোলন শুরু করেন তখনও তারানাথ বাচস্পতি তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন। তারানাথের মত মানুষ এদেশে কেন ইউরোপেও বিরল।

জ্ঞান-সাধনার ধারাটি আজও বর্ধমানে অব্যাহত রয়েছে। বর্ধমানের শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়ায় প্রখ্যাত রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জন্ম। ইনি পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। এঁর চলন্তিকা অভিধান বাঙালীর ঘরে ঘরে ব্যবহার করা হয়। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান রূপে বিখ্যাত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যশস্বী লেখক অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের বাড়ী বর্ধমান শহরেই রয়েছে। বাংলা দেশের সুধী মহলে তাঁর নামটি সুপরিচিত। আজও বর্ধমানে বিদ্যাসাধনার ধারা অব্যাহত। বর্ধমানের রাজাদের রাজবাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান জেলা আজ নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

৪



বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার নামকরণ বোধ করি ধর্মঠাকুরের বাঁকুড়া রায় নাম থেকেই হয়েছে। অনেকে অবশ্য বলেন বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের অন্যতম পুত্র বীর বাঁকুড়া যে অঞ্চলে রাজত্ব করতেন সেই অঞ্চলটিই আজ বাঁকুড়া জেলা বলে পরিচিত। জেলাটির পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা, উত্তরে বর্ধমান জেলা, পূর্বদিকে হুগলী আর দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা।

বীরভূমের মতই এখানকার মাটির রঙ লাল। মাটিতে কাঁকর মেশানো। জেলার মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চল কিছুটা সমতল। বাঁকুড়ায় এখনও কিছু বন আছে। সে বনে আছে শাল, পিয়াল আর পলাশ। দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর আর কংসাবতী নদী জেলাটির মাটিকে করেছে সরস। তাই এখানে ধান, আখ, পাট আর তামাক ফলে ভাল।

বাঁকুড়ায় বড় শিল্প নেই। এ জেলাটি কুটির-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিষ্ণুপুরের রেশম ও তসর আজও আগ্রহ সহকারে সকলে ব্যবহার করে। লক্ষীসাগরের পিতল কাঁসার জিনিষপত্রের খ্যাতি আছে। বাঁকুড়ার শাঁখ বাঙালী গৃহস্থ-বধূরা আজও ব্যবহার করে থাকেন। লাক্ষা-শিল্পেও একদিন জেলাটির নাম ছিল। বিষ্ণুপুরের সুগন্ধি তামাকের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে। জেলাটির প্রাচীন ইতিহাস বৈচিত্র্যে ভরা।

আদি-অষ্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতির মিলনের ক্ষেত্র বাঁকুড়া জেলাটি। অনার্য বলে গণ্য অথচ খাঁটি বাঙালী বলে স্বীকৃত ধীবর, বাউরী, ডোম, সাঁওতাল প্রভৃতি মানুষের বাস বাঁকুড়া অঞ্চলেই বেশী।

এই সব মানুষদের লোককথা ও সংস্কৃতির মধ্যেই প্রাচীন বাংলার হারানো ইতিহাসের সন্ধান মিলতে পারে।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। অঞ্চলটা ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা। প্রাচীন আদিবাসীদের বাসভূমি। এই ভুভাগটিই ছিল প্রাচীন সুহ্মদেশ। মহাভারত পড়ে জানা যায় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্তপতি ও সুহ্মরাজকে পরাজিত করেন।

বর্তমানের বর্ধমান, বীরভূম আর বাঁকুড়া জেলা প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর আর দক্ষিণ বঙ্গে আগে আর্যসভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চল আর্য-প্রভাবে আসে অনেক পরে। এক বিচিত্র ঘটনায় বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল সুসভ্য ও সুসংস্কৃত হয়ে ওঠে।

প্রাচীন বাংলা দেশের এক রাজকন্যাকে রাঢ়দেশের অরণ্যভূমির এক রাজা বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন। রাজকন্যার প্রভাবে আরণ্যক রাজার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। এঁদের যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন সেই রাজকুমার রাঢ়ের জঙ্গল হাসিল করে গ্রাম ও লোকালয়ের পত্তন করেন।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরের পোড়ামাটিতে খোদাই করা অশ্বারোহী আর ধনুর্বানধারী মল্লবীরদের চিত্র প্রাচীন বাংলার শৌর্যময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষ্ণুপুরের মল্ল উপাধি-ধারী রাজারা ছিলেন খাঁটি বাঙালী। আর্যরক্তের মিশ্রণ এদের মধ্যে নেই। বাঁকুড়ার মল্লরাজদের প্রতাপে একদিন দিল্লীর বাদশাহও ভীত ছিলেন। বাংলা দেশের পশ্চিম সীমান্তের প্রহরীর মত বিষ্ণুপুর

রাজ্য পশ্চিমের আক্রমণকারীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঠেকিয়ে রেখেছে।

মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর দুর্ধর্ষ বর্গীবাহিনী নিয়ে বিষ্ণুপুরের দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন।

পরম বৈষ্ণবরাজা গোপাল সিং দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা না করে হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ করেন। এদিকে দুর্গ শত্রু অধিকারে যায় দেখে, কুলদেবতা মদনমোহন স্বয়ং দুর্গ থেকে কামান দেগে বর্গীদলকে পর্যুদস্ত করেন। বলা বাহুল্য এটি জনশ্রুতি। যে কামান দিয়ে শত্রুদল মর্দিত হয় সেই কামানটির নাম হয় দলমর্দন। পরে লোকমুখে বদলে দলমাদল নাম ধারণ করে। সেটি আজও বিষ্ণুপুরে রক্ষিত আছে।

বৃটিশ আমলে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের প্রতাপ ক্রমশঃ কমে আসে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ঢালী বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন কুম্ভকারগণ। ধনুকধারী আদিবাসী কোলেরা, অশ্বারোহী ডোমেরা আর সাধারণ চাষীরাও এগিয়ে যেতেন বীর বিক্রমে। স্বদেশী রাজার এঁরাই ছিলেন যথার্থ গণ-বাহিনী। মল্লভূম থেকেই একটা ছড়া সৃষ্টি হয়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ছড়াটি সবার জানা আছে, তবু উল্লেখ করা হল,—

আগে ডোম, বাগে ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে
ঢাল, মেঘর, ঘাঘর বাজে।

এর মানে সামনে, পাশে অশ্বারোহী ডোম সৈন্যেরা সজ্জিত হয়েছে। বাজনা বাজছে। এসব যুদ্ধের প্রস্তুতি আর কি।

ষোড়শ শতকের শেষে বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে বিষ্ণুপুরে। সুদূর বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব-গোস্বামীগণ বাংলাদেশে গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে বৈষ্ণব-পুঁথি পাঠাচ্ছিলেন। সেই বৈষ্ণব-পুঁথিগুলোর মধ্যে ছিল মহাভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি।

বৃন্দাবনের চৈতন্য-সেবকগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণদাস নব্বই বছর বয়সে লেখনী ধারণ করে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রমে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্যের প্রথম জীবনের কথা লিখেছেন নিপুণভাবে, কিন্তু চৈতন্যের শেষ জীবনের কথা সংক্ষেপে সেরেছিলেন। তাই কৃষ্ণদাস চৈতন্যের অন্তলীলা অনুপম ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করেন এই চৈতন্য-চরিতামৃত পুঁথিতে।

গ্রন্থ প্রচারের জন্য চরিতামৃত পুঁথি গৌড়দেশে প্রেরিত হল গরুর গাড়ীতে। গাড়ীর সঙ্গে গেলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ ঠাকুর। দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে তাঁরা বাংলাদেশের সীমান্ত রাজ্য বা বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন।

সেকালে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে দস্যুর অভাব ছিল না। গরুর গাড়ী বোঝাই পুঁথি দেখে লোভী দস্যুরা তা লুঠ করে। এ সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছলে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে চেতনা হারালেন, সে চেতনা আর ফিরে আসে নি।

এদিকে লুণ্ঠিত পুঁথি পড়ে বীর হাম্বীরের হাতে। তিনি সে পুঁথি প্রত্যর্পণ করেন শ্রীনিবাস আচার্যকে। শুধু তাই নয় শক্তির উপাসক হাম্বীর, শ্রীনিবাসের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বৈষ্ণবধর্মও গ্রহণ করেন। মল্লভূমের ইতিহাসে ঘটনাটি বৈপ্লবিক। দেখতে দেখতে প্রজারাও রাজধর্ম গ্রহণ করেন।

বিষ্ণুপুরের আরেকটি বিচিত্র কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, তারও চেয়ে বেশী প্রচারিত হয়ে আছে লোকমুখে—জনশ্রুতি আর কিংবদন্তীতে। সেটি বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ আর এক নর্তকী লালবাঈকে কেন্দ্র করে।

মেদিনীপুরের বিদ্রোহী শোভা সিং বর্ধমানের রাজকন্যাকে অপমান করতে গিয়ে ছুরিকাহত হন। এই শোভা সিং-এর সাহায্য-কারী রহিম খাঁর এক ক্রীতদাসী সুন্দরী নর্তকী লালবাঈকে রঘুনাথ

সিংহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন এবং বিবাহ করেন। নিজ পুত্রকে ভবিষ্যতে রাজা করার প্রতিশ্রুতি চতুরা লালবাঈ রঘুনাথের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। শুধু তাই নয় সারা রাজ্যের প্রজাদের নিমন্ত্রণ করে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করিয়ে তাদের জাতিনাশের ব্যবস্থাও পাকা করে লালবাঈ।

কিন্তু তার সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন মহারাণী চন্দ্রপ্রভা, রঘুনাথের সাধ্বী পত্নী। ইনি রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণে স্বামীকে হত্যার ব্যবস্থা করেন এবং মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ক্রুদ্ধ প্রজারা লালবাঈ আর তার সন্তানকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। আজ লালবাঁধ আর ভোজনতলার মাঠ পুরানো স্মৃতিকে জাগ্রত করে দেয় মাত্র।

কিছুকাল আগে বিখ্যাত লালবাঁধ সংস্কারের সময় জলের ভেতর পাঁকের মধ্যে শৃঙ্খলিত এক নারীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। কাছেই ভোজনতলার মাঠেই নাকি প্রজাদের নিষিদ্ধ মাংসের নিমন্ত্রণ খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বাঁকুড়ায় বিখ্যাত জায়গার অভাব নেই। সবার আগে ছাতনা গ্রামের কথা বলা যাক। সুপ্রাচীন সীমান্তভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল ছাতনা। এখানকার বাসলী দেবীর মন্দিরের স্থাপত্য দর্শনীয় এই বাসলী দেবীর পূজারী ছিলেন কবি চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস-সমস্যা বাংলা-সাহিত্যে বেশ কৌতুকাবহ অথচ জটিল সমস্যা। বীরভূম জেলার নান্নুরে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়েছিল, এমনি ধারণা আগেও প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বছর পঞ্চাশেক আগে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রাম থেকে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরে থেকে। পুঁথিখানির সামনের ও পিছনের কিছু পত্র না পাওয়ায় পুঁথিখানির নাম কি জানা যায় না বোঝাও যায় না কোন্ সময়ে পুঁথিখানি রচিত। তবে পুঁথির ভাষা দেখে বুঝতে পারা যায়

পুঁথিখানি বেশ প্রাচীন। ভাব ও ভাষায় চণ্ডীদাস পদাবলীর সঙ্গে বেশ গরমিল। বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় পুঁথিখানির নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় বাসলী দেবীর অনেক বন্দনা রচনা করেছেন, তন্ত্রের বিশালাক্ষী দেবীর যে ধ্যানমূর্তি তার সঙ্গে ছাতনার বাসলীদেবীর বেশ সাদৃশ্য আছে। মনে হয় চণ্ডীদাস একাধিক।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে আজ বৈষ্ণব-দেবতা প্রতিষ্ঠিত। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, গোপাল, মদনমোহন প্রভৃতির মন্দির বিষ্ণুপুরের প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি সাক্ষী হয়ে আছে। তবু পুরাতন তান্ত্রিক আচার আচরণ আজও ধীবর, বাউরী, ডোম এদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ভুললে চলবে না বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের আগে হাম্বীর ছিলেন শৈব। বাংলাদেশের একেবারে সীমান্তে বলেই বোধ করি অরণ্য ঘেরা বিষ্ণুপুরের খাঁটি বাঙালীর ঐতিহ্য অনেক সংঘাত ঠেকিয়ে আজও বেঁচে আছে। আজও বিষ্ণুপুরের খড়ের বাঁকানো চালের মাটির ঘর দেখলে হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। বিষ্ণুপুর দুর্গের দেবালয়গুলিতে আজও খাঁটি বাঙালী শিল্পীর হাতের ছোঁওয়া অক্ষয় হয়ে আছে। বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটির যে অপূর্ব চিত্রাবলী রয়েছে তা আর অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না।

বহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির দশম শতাব্দীতে নির্মিত। অনেকে বলেন জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মন্দির ছিল এটি। এটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তুলনা হয় না।

ধরাপাট গ্রামের বিষ্ণুমন্দিরটিও দর্শনীয়। পার্শ্বনাথের মূর্তিকে পালটে নাকি বিষ্ণুমূর্তি করা হয়েছে।

বাঁকুড়া যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদেবতা বিষ্ণুর উপাসক তার প্রমাণ মিলেছে শুশুনিয়া শৈলের লিপিতে। বাঁকুড়া শহর থেকে ১৪ মাইল দূরে প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু শুশুনিয়া পাহাড়

এই পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন পুষ্করণা রাজ্যের অধিপতি চন্দ্রবর্মার গৌরবের কথা লেখা আছে। এই পুষ্করণা রাজ্যের রাজা চন্দ্রবর্মা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক।

শুশুনিয়ার কাছে পোকরণা গ্রাম আজও প্রাচীন পুষ্করণার স্মৃতি বহন করছে। পুষ্করণার মাটির তলা থেকে বাসুদেব মূর্তি ছাড়াও সূর্য দেবতা ও ব্রহ্মার মূর্তি পাওয়া গেছে।

বিষ্ণু ছাড়াও বাঁকুড়ায় শিবের পূজারও খুব প্রচলন ছিল। এক্তেশ্বর বাঁকুড়ায় বিখ্যাত শৈব-তীর্থ। এখানকার শিবের গাজন ও মেলা খুব বিখ্যাত। বাংলাদেশে এক্তেশ্বরের মন্দিরটির অনুরূপ মন্দির আর নেই। এটি ইটের তৈরী বলে মনেই হয় না—এমন নিরেট গড়ন মন্দির দেখে বোধ হয় যেন পাহাড়ের গা কেটে শিলা-মন্দিরটি দ্বারকেশ্বর নদের তীরে তৈরী হয়েছে।

বাঁকুড়ার ময়নাপুর গ্রামটি প্রাচীন লোক-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। আর্য্য-সংস্কৃতি ও আর্য-দেবতার পাশাপাশি আজও এখানে ধর্ম-ঠাকুরের পূজা চলে বেশ ধুম-ধামের সঙ্গে। এককালে যে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল তার প্রমাণ এখানকার প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিগুলো। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ধর্মঠাকুরের মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমাজের নীচের তলায় আশ্রয় পেয়েছিল।

ধর্মঠাকুরের নানা নাম এ অঞ্চলে। তবে তার মধ্যে বাঁকুড়া রায় নামটিই প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়া রায়ের একটি সুন্দর মন্দির আজও টিকে আছে ময়না গ্রামে। জনশ্রুতি এখানে নাকি ধর্মমঙ্গল কাহিনীর রাজা লাউসেনের রাজধানী ছিল। বিখ্যাত 'হাকন্দ' দীঘিরও অস্তিত্ব রয়েছে এই গ্রামে। শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের বাসগ্রামও নাকি ছিল এই ময়না গ্রামে। জয়রামবাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদামণি দেবীর জন্মস্থান।

সোনামুখী গ্রাম বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। এখানকার গোবিন্দ দাসের মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। এটি বাঙালী শিল্পীর হাতে গড়া স্থাপত্য

শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন। সোনামুখী থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব খুব বেশী নয়।

এই বিষ্ণুপুরই বাঁকুড়ার সংস্কৃতির কেন্দ্র। বিষ্ণুপুরের শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব শুধু বাঁকুড়ায় নয় সারা রাঢ়-বঙ্গেই এক সময় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিষ্ণুপুর সুর-সাধনার তীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছিল প্রায় শ' তিনেক বছর ধরে। উনবিংশ শতকে কলিকাতায় যে নতুন সঙ্গীত সাধনার উদ্যম দেখা দেয় তারও প্রেরণা বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যগণ।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধকদের কথা বলার আগে বিষ্ণুপুরের কথকদের কথা বলা দরকার। বিষ্ণুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। অনেক দূর দেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন বিষ্ণুপুরে উপযুক্ত গুরুর কাছে কথকতা শিখতে। বাংলাদেশের মধ্যে কথকতা শিক্ষার জন্য টোল খুলেছিলেন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পূর্বপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লী থেকে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে বিষ্ণুপুরে এনেছিলেন রঘুনাথ সিং। বাহাদুর খাঁর সঙ্গে এসেছিলেন পীরবকস। এই পীরবকস ছিলেন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক। তাঁর শিষ্যরা সুদক্ষ মৃদঙ্গবাদকরূপে সারা বাংলাদেশে খ্যাতিলাভ করেন। কথকতা ও মৃদঙ্গবাদনের খ্যাতির চেয়ে দেশজোড়া সম্মান বিষ্ণুপুরের তার সুর-সাধকদের জন্য। বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য যদুভট্টকে মানভূম-পঞ্চকোটের রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। রঙ্গনাথ ত্রিপুরার মহারাজরা তাঁকে ডাকতেন 'তানরাজ' বলে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় এঁর কাছে সঙ্গীতে দীক্ষা পান।

প্রসিদ্ধ গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আনেন। পরে তাঁকে ভারত-সঙ্গীত-সমাজের আচার্যের পদে নিযুক্ত করেন। এই রাধিকা গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন বিখ্যাত জ্ঞান গোঁসাই।

সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত শিক্ষক। কলকাতার প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয় বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। এঁরা ছাড়া সঙ্গীত-বিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য কেশবলাল চক্রবর্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নামও সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদেরই যোগ্য উত্তর-সাধক ছিলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের সঙ্গীত-জগতে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধনার ধারাটি "বিষ্ণুপুর ঘরানা" বলে পরিচিত।

শুধু সঙ্গীত নয় বাংলাদেশের জ্ঞান-তপস্যার ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া বেশ কয়েকজন মনীষীকে দান করেছে। তাঁদের মধ্যে সর্ববিদ্যা-বিশারদ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইতিহাস, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত সর্ব বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা দেশ বিদেশের সুধীজনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এঁকে ডি, লিট, উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বাঁকুড়ায় তাঁর গৃহে গিয়ে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসব করে তাঁর হস্তে উপাধিপত্র দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন ব্যাপার আর ঘটেনি। ৯৭ বছর বয়সে যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে।

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার সুসন্তান। এঁর সম্পাদিত প্রবাসী আর মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় নির্ভীকভাবে ইনি ইংরেজের সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচারক হিসাবেও ইনি শ্রদ্ধেয়। সম্প্রতি বিষ্ণুপুরে এঁর নামে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

বাংলা দেশের সংস্কৃতি ভূমি বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার মন্দির, বাঁকুড়ার সঙ্গীত, বাঁকুড়ার বীর মল্লযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী, বাঁকুড়ার আর্য ও অনার্য দেবদেবী, তার বৈষ্ণবভক্তি তার সারস্বত সাধনা—সারা দেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

৫

বীরভূম

বীরভূম জেলার নামকরণ নিয়ে নানা মত-পার্থক্য আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে রাঢ়ভূমির এই অঞ্চলটিকে কামকোটি বলা হত। আবার কেউ কেউ বলেন সেন বংশীয় রাজা বীরসেনের নাম অনুসারেই ভূখণ্ডটির বীরভূম নাম হয়েছে। তবে জেলাটিতে গভীর জঙ্গল ছিল এককালে। সেই জঙ্গলে বাস করত সাঁওতাল আর মুণ্ডারী জাতি। তাদের ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল। কাজেই মনে হয় তাদের বাসভূমিই পরে বীরভূম নাম পেয়েছে।

জেলাটির উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিহার রাজ্য, পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান। দক্ষিণ দিক জুড়েও রয়েছে বর্ধমান জেলা। বর্ধমানেরও দক্ষিণে রয়েছে বাঁকুড়া। এই তিনটি জেলা ছাড়াও উত্তর-মেদিনীপুর পশ্চিম-হুগলী ও পশ্চিম-মুর্শিদাবাদ রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' মানে পাথুরে জমি। সত্যই বীরভূমে, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের লালমাটি পাথর মেশান। বহু প্রাচীন যুগের পাললিক শিলা দিয়ে তৈরী বীরভূমের কঠিন ভূখণ্ড। অবশ্য অজয় নদের উত্তর ভাগ থেকে বোলপুর অঞ্চল পর্যন্ত কিছু অংশ সমতল ও নরম। চাষের উপযোগী বালি আর মাটি মেশান দোঁয়াশ মাটি জেলাটিতে দেখতে পাওয়া যায়।

বীরভূমের প্রধান নদী অজয় আর ময়ূরাক্ষী। অজয় নদ বীরভূম আর বর্ধমানের সীমারেখা চিহ্নিত করেছে।

ময়ূরাক্ষী সাঁওতাল পরগণা থেকে বেরিয়ে সিউড়ীর কাছ দিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে চলে গেছে। জেলার প্রধান শহর সিউড়ীর কাছে তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর জলস্রোতে বাঁধ দিয়ে ৬ লক্ষ একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনও হচ্ছে চার হাজার কিলোওয়াট। বক্রেশ্বর নদীর বিখ্যাত উপনদী কোপাই বোলপুরের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এর উল্লেখ আছে। জেলাটির প্রধান ফসল ধান, এ ছাড়া আখ ও তামাকের চাষও হয়। বীরভূমে বৃহৎ শিল্প না থাকলেও কুটির শিল্পের জন্য জেলাটির খ্যাতি আছে।

রাজনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত। পাঁচমুড়ার শিল্পীর তৈরী ঘোড়া নিউইয়র্কের বসবার ঘরের শোভা বাড়াচ্ছে হাল আমলেও। তাঁত, রেশম ও কাঁসার শিল্পই জেলাটির সম্পদ। বর্তমান কালে শ্রীনিকেতনের কুটির শিল্প বাংলাদেশের মান বাড়িয়েছে। জেলাটির মধ্যে পূর্ব রেলপথের একটা শাখা চলে গেছে। ন্যারো-গেজের ছোট ট্রেনও চলে আমেদপুর কাটোয়ার মধ্যে। সিউড়ী থেকে বাসে দুমকা ভাগলপুরে যাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকে যখন বাংলাদেশের দিকে দিকে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হয়, তখনই বোধ করি বীরভূমের রাজনগরের হিন্দু নরপতি রাজধানী ত্যাগ করে সিউড়ীর কাছে বীরসিংহপুর বা বীরপুরে চলে আসেন। বিষ্ণুপুরের হিন্দু সামন্ত রাজারা আর রাজনগরের মুসলমান শাসন-কর্তারা সুবাদারের কাছে হাজিরা দিতে যান নি কোনদিন। রাজস্বও কখন জমা দেননি।

তাঁরা ছিলেন প্রায় স্বাধীন। পাশাপাশি রাজ্য হলেও এই দুই সামন্ত রাজার মধ্যে কখনও বিরোধ হয় নি। এঁরা একযোগে বাংলা দেশের সীমান্ত পাহারা দিয়েছেন অতন্দ্র প্রহরীর মত কয়েক শতাব্দী ধরে।

যেদিন দুরন্ত মারাঠা বর্গীর দল বাংলা দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেদিন এই দুই সীমান্ত প্রহরী রাজ্য একযোগে তাদের বাধা দিয়েছে।

পালযুগে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। তার ঐশ্বর্য আক্রমণকারীদের প্রলোভিত করেছে। যতদিন গৌড়ের সিংহাসনে ধর্মপাল কি দেবপালের মত রাজা ছিলেন ততদিন বাঙালী ছিল অপরাজেয়। যেদিন মহীপালের পুত্র নয়পালের মত দুর্বল রাজা সিংহাসনে বসলেন, সেদিন পশ্চিম ভারতের কলচুরীরাজ কর্ণদেব বাংলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

প্রথম যুদ্ধে তিনি বাঙালী যোদ্ধাদের পরাক্রমের কাছে পরাস্ত হয়ে মনের ক্ষোভে কতকগুলো বৌদ্ধমঠ আর বিহার ধ্বংস করেন। এই সময়ে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিনি মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন। কলচুরীরাজ ও পালরাজের মধ্যে সন্ধি হয়।

এর কিছুদিন পরে তিব্বতের রাজার আহ্বানে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে ঊনষাট বছর বয়সে দীপঙ্কর তিব্বত চলে যান। তখন কলচুরীরাজ কর্ণদেব সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে আবার গৌড়দেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কিন্তু কর্ণদেব পুনরায় পালরাজার কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে কর্ণদেব পালরাজ বিগ্রহপালের সহিত সন্ধি করেন। সন্ধির সর্ত হিসাবে কর্ণদেব তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে গৌড়রাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে বিবাহ দেন। বীরভূমের পাইকোড়ের শিলালিপি তার প্রমাণ। এটি এখন অবহেলিত অবস্থায় একটা পুকুরের ধারে পড়ে আছে।

বীরভুমের যে পীঠস্থানটি আধুনিক কালেও সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি বক্রেশ্বর। অনেক বিখ্যাত তান্ত্রিক বক্রেশ্বরের তীর্থে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে অঘোরী বাবার নাম সারা বাংলা দেশের লোক জানেন। বক্রেশ্বরে অসংখ্য

মন্দির রয়েছে। মন্দিরগুলোর স্থাপত্যে শুধু যে বাঙালী শিল্পীর হাত রয়েছে তা নয়, উড়িষ্যার স্থাপত্যের ছাপও অনেক প্রাচীন মন্দিরের গায়ে রয়ে গেছে। বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে ছিল তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ অঘোরী বাবার আস্তানা। গভীর রাতে যখন শিবাকুল মুহুর্মুহু ডেকে উঠত সেই সময় অঘোরী বাবা 'সাধনচক্রে' বসতেন। শ্মশানের মধ্যে তাঁর সমাধিস্থান আজও রয়েছে।

বক্রেশ্বরের গরম জলের কুণ্ডগুলো অতি বিখ্যাত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বক্রেশ্বরকে একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে গণ্য করে পর্যটকদের দেখবার ব্যবস্থা করেছেন।

বক্রেশ্বরের মত আর একটি প্রখ্যাত তন্ত্রতীর্থ তারাপীঠ। এখানকার শ্মশানকে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষ্যাপা তাঁর সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এখানেই নাকি সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে সতীর নেত্রাংশ বা চোখের তারা পড়েছিল। এই তারাপীঠের সম্পর্কে প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে একটি কাহিনী আছে। একবার বশিষ্ঠ মুনি কামাখ্যা প্রভৃতি জায়গায় সাধনায় ব্যর্থ হয়ে ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। বুদ্ধ তাঁকে বীরভূমের সুবিখ্যাত তারাপীঠে সাধনা করতে বলেন। তখন বশিষ্ঠ তারাপীঠে উগ্রতারার সাধনা করে সিদ্ধ হন। এই বশিষ্ঠ আর কেউ নন, ইনি সিদ্ধাচার্য নাগার্জুন। ইনি ভোটদেশ অর্থাৎ তিব্বত, নেপাল থেকে তান্ত্রিক বিদ্যাকে নবরূপে বাংলা দেশে এনেছিলেন।

সুদর্শনচক্রে খণ্ডিত হয়ে সতীর দেহাংশের অনেকগুলো খণ্ড বীরভূমে পড়েছিল। তারাপীঠে পড়েছিল চোখের তারা আর নলহাটিতে নলা বা কনুই-এর নিম্নভাগ। আবার কেউ বলেন, দেবীর ললাট পড়েছিল এখানে। নলহাটিতে তান্ত্রিক সাধনা হয়েছে বটে কিন্তু এটি তারাপীঠের মত তন্ত্রোক্ত পীঠস্থান নয়। কালীঘাট আর বক্রেশ্বরের মত নলহাটির খ্যাতিও পরবর্তী কালের।

নলহাটির কাছেই চার পাঁচ মাইলের মধ্যে ভদ্রপুর গ্রাম। এই গ্রামেই মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম। তাঁর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ আজও অতি জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে ইনি ছিলেন হুগলীর ফৌজদার। পরে ইংরেজ পক্ষে যোগ দিলেও ইংরেজ বণিকদের ধূর্ততা ইনি ধরে ফেলেছিলেন—তাঁদের সঙ্গে এঁর বেধে ওঠে সংঘাত, তাই ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংস এক হীন চক্রান্তের জালে এঁকে জড়িয়ে ফেলে বিচারের মিথ্যা প্রহসন করে তাঁকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেন। মহারাজা ছিলেন শক্তির উপাসক।

বীরভূমের কথা বলতে বসে অজয় নদের তীরের কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গ্রামের কবি জয়দেবের আর তাঁর নৃত্যগীত-পটিয়সী পত্নী পদ্মাবতীর কথা না বললে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব মিশ্র। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দম্ বাংলাকাব্য সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস। যদিও কাব্যগ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু কি সুললিত সহজ সে ভাষা—পড়তে এতটুকু বাধে না, বুঝতে কষ্ট হয় না। একটু নমুনা তুলে দেওয়া গেল—

ধীর সমীরে যমুনাতীরে—
বসতি বনে বনমালী।

জয়দেব গান গাইতেন আর পদ্মাবতী সেই গানের তালে তালে নাচতেন। কিংবদন্তী আছে স্বয়ং ভগবান নাকি কবি জয়দেবের রূপ ধরে এসে—তাঁর কবিতার পাদপূরণ করিয়ে দিয়ে যান।

কাহিনীটি এই রকম—কবি জয়দেব একবার স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং পর্যন্ত লিখে পরের ছত্র কি হবে স্থির করতে না পেরে স্ত্রীর অনুরোধে স্নান করতে যান। ইতিমধ্যে স্বয়ং নারায়ণ জয়দেবের রূপ ধরে এসে পুঁথির পাতায় লিখে দিয়ে যান 'দেহি পদপল্লব মুদারম্।'

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকার চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বীরভূমের নান্নুর। অবশ্য এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বাঁকুড়ার ছাতনাকে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বলে দাবী করা হচ্ছে। ছাতনায় আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও চণ্ডীদাসের মর্মস্পর্শী ভাষার এমন গরমিল দেখে অনেকে বলেন চণ্ডীদাস একাধিক।

সম্প্রতি সুপণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন নান্নুরের কাছেই বর্ধমানের কেতুগ্রামে ছিল চণ্ডীদাসের ভিটা। বীরভূমের এই মরমী 'কবি ছিলেন সহজিয়া সাধক। আবার তিনি তান্ত্রিক পুজারীও বটে।

বীরভূম শৈবধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনার সমন্বয়ভূমি। তাইতো এখানে চণ্ডীদাসের মত মরমী ভক্ত লোককবির আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে।

সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক কালেও বীরভূমের জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা—যেদিন বোলপুরের কাছে ভুবনডাঙ্গার মাঠের রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা ছাতিম গাছের তলায় বিশ্রাম নেন। ভারি ভাল লাগে মহর্ষির। জায়গাটার কোনদিকে লোকালয় নেই—সেই নির্জনতায় তাঁর ধ্যানের সুবিধা হবে ভেবে জায়গাটা স্থানীয় জমিদার সিংহদের কাছ থেকে কিনে নেন। এখানে একটা ছোট বাড়ী তৈরী করে নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতন'। দীর্ঘকাল জায়গাটা অনাদৃত হয়ে পড়েই ছিল।

তারপর একদিন এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন প্রখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বোলপুরের সেই ছোট্ট বিদ্যালয় ধীরে ধীরে সারাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্র এসে উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। স্থানটি দেখতে দেখতে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়ে ওঠে।

ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর মত সুপণ্ডিত মানুষ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে এসে নীরবে জ্ঞানচর্চা করেছেন। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বোলপুরে কবির আশ্রমে বসেই তাঁর সুবিপুল গ্রন্থের সূচনা করেন। বাংলা-সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

সিলভাঁলেভি, বগদানভ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে আসেন। এন্ড্রুস, পিয়ার্সনের মত বিদেশী কর্মবীরেরা শান্তিনিকেতনের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করে গেছেন। দেশ স্বাধীন হলে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দান করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর হন।

উত্তর বা পূর্ব বাংলার মত রাঢ় অঞ্চল শীঘ্র মুসলমান আধিপত্য মেনে নেয়নি। তার কারণ উত্তর ও পূর্ব বাংলায় ছিল বৌদ্ধ-প্রাধান্য। সেই অঞ্চলের বহু লোক পীর ফকির আর আউলিয়াদের প্রচারে আর হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগবশতঃ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ধর্মঠাকুরের মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে। আর পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে হিন্দু-সমাজের অত্যাচারিত নিম্নবর্ণদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পথে বাধা দেন।

বীরভূমের বারা গ্রামটি বড় বিচিত্র। চারদিকের হিন্দু-প্রাধান্যের মধ্যে এটি মুসলিম প্রধান। কারণ আর কিছু নয় এখানে বজ্রযানী বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। আজও বারা গ্রামের মাটির তলা থেকে পালযুগের ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন গ্রামবাসীদের কোদালের মুখে বেরিয়ে আসে। বারাগ্রাম একেবারে ব্রাহ্মণশূন্য।

বারাগ্রামে আজও সিংহাসনে উপবিষ্টা ভুবনেশ্বরী দেবীর মূর্তির পুজা হয়। মনে হয় বৌদ্ধ-প্রজ্ঞাপারমিতা পরবর্তীকালে হিন্দু

প্রভাবে ভুবনেশ্বরী মূর্তিতে পরিবর্তিত হয়েছেন। এমন মূর্তি সারা পশ্চিমবঙ্গ খুঁজলে খুব বেশী মিলবে বলে মনে হয় না।

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদিন বলেছিলেন ধর্মঠাকুরের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বেঁচে আছে। বজ্রযানীদের মত উগ্রপন্থীরা ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে বৌদ্ধরা ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করেই হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। বাকী যাঁরা ছিলেন তাঁরা চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন।

বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ীর মালাকরপাড়ায় ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। সিউড়ীর বারুইপাড়ার ধর্মঠাকুরও বিখ্যাত। সিউড়ী থেকে বারো মাইল দক্ষিণে রাজনগর থানার মধ্যে তাঁতিপাড়া গ্রামে ও কাছাকাছি ধানকুনে গ্রামে ধর্মরাজ আছেন। সাধারণতঃ বৈশাখের বুদ্ধ পূর্ণিমা থেকে আরম্ভ হয়ে শ্রাবণ পূর্ণিমা পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের পূজার সময়।

এক এক অঞ্চলের ধর্মঠাকুর এক একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। লাঙ্গুলিয়া গ্রামের ধর্মরাজ পেট বেদনা, বাত, পা-ফোলার দেবতা বলে খ্যাত। বেলের ধর্মরাজ দেন বাতের ঔষধ। ধর্মঠাকুরকে বীরভূমের শ্রেষ্ঠ গ্রাম্য দেবতা বলা যায়। কারণ ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে চড়কের মেলা বসে, গাজন-উৎসব হয়। এগুলি অনার্য লোক-উৎসব—নিঃশব্দে আর্য প্রভাবিত সমাজে স্থান করে নিয়েছে।

ধর্মরাজের কোন বিশেষ মূর্তি বীরভূমে নেই। কূর্মাকৃতি প্রস্তর-খণ্ডই ধর্মরাজরূপে পূজিত হন। ধর্মঠাকুর কোথাও ধর্মরাজ, কোথাও বুড়োরাজরূপে পূজা পান। ক্রমে ক্রমে ধর্মঠাকুর মূর্তি ধারণ করে হন বাবাঠাকুর।

আধুনিক কালেও বীরভূমের অনেক খ্যাতিমান সন্তান দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্মস্থান কুশমোর গ্রামে। বাঙালী ছাত্র-সমাজ এঁর নামটির সঙ্গে সুপরিচিত।

সিউড়ীর দশ ক্রোশ দূরবর্তী কুড়মিঠা গ্রামের পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন চণ্ডীদাস পদাবলীর সম্পাদনা করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বীরভূমের গ্রামে গ্রামে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ঘুরে ঘুরে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপাদান সংগ্রহ করেন তা' 'বীরভূম বিবরণ' নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়ে মনীষিবর্গের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি এঁর সংগৃহীত ও সম্পাদিত প্রায় সাড়ে চার হাজার বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় প্রায় ষাট বছরের পরিশ্রমে এই বিরাট কার্য সম্পন্ন করেছেন একক প্রচেষ্টায়।

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান লাভপুরে। সম্প্রতি এঁর "গণদেবতা" উপন্যাস 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছে। কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে গুণীর মর্যাদা দান করেছেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাঢ়ভূমির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঞ্চল বীরভূম বাংলা দেশের কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিভাবান মানুষের জন্ম দিয়েছে। আজও সে ঐতিহ্য বজায় আছে। বীরভূমের রুক্ষ লাল পাথুরে মাটির তলায় ফল্গুর মত অমৃতের ধারা প্রবাহিত আজও বীরভূমে বাউলের দল পায়ে ঘুঙুর পরে, হাতে একতারা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ায়।

৬

পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গের সর্ব পশ্চিম প্রান্তের জেলা পুরুলিয়া। বিহারের ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত জেলা মানভূমের মধ্যে ছিল পুরুলিয়া। দামোদর নদ মানভূমকে প্রায় দুভাগে ভাগ করেছে। দামোদরের উত্তর দিকে ধানবাদ মহকুমা—আর দক্ষিণে পুরুলিয়া। এই অঞ্চলে একদিন অনার্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাত ও পরে মিলন ঘটেছিল। সেই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র হিসাবে পুরুলিয়া জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

মাত্র একটি মহকুমা নিয়ে গঠিত পুরুলিয়া জেলাটি ছিল মানভূমে। মানভূম জেলা ১৯১১ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙালী তরুণদের আত্মদানে বঙ্গভঙ্গ রদ্ হলো। মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া জেলাকে বিহার প্রদেশের সঙ্গে আর গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট জেলাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয় সুচতুর ইংরেজ শাসকরা। এগুলি ছিল বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল। বাঙালী জাতিকে দুর্বল করাই ছিল ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানার পুনর্বিন্যাস হলে পুরুলিয়া আবার ফিরে আসে পশ্চিমবঙ্গে।

জেলাটির উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দিক ঘিরে আছে বিহার, কেবল পূর্বদিকে বাঁকুড়া জেলা। মেদিনীপুরের আর বর্দ্ধমানের সঙ্গে জেলাটির পূর্ব ও উত্তর দিকে সামান্য সংযোগ ঘটেছে।

জেলাটি ছোটনাগপুরের উচ্চভূমির অন্তর্গত। তাই সারা জেলা জুড়ে মোচাকৃতি ছোট ছোট পাহাড়ের সারি দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এই পাহাড়গুলোকে ডুংরী বলে। জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের শ্রেণী। এর মধ্যে অযোধ্যা পাহাড় উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা মাত্র ২২২০ ফুট। এ ছাড়া রয়েছে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেৎ পাহাড়-শ্রেণী জেলার উত্তর-পূর্ব সীমানায়।

জেলাটির মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাঁসাই নদী। এ ছাড়া রয়েছে পশ্চিমপ্রান্তে সুবর্ণরেখা নদী আর দক্ষিণ দিকে কুমারী নদী। জেলাটির ভূভাগের ঢাল পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে, তাই নদীগুলি ঐ দিকেই বয়ে গেছে। জেলাটির কঠিন পাথুরে জমির বুক কেটে বয়ে গেছে ক্যাংসাই টট্‌কোর মত নদী ছাড়াও আরও অসংখ্য স্রোতধারা। এগুলি শীত ও গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়ে থাকে, কিন্তু বর্ষার জল পেয়ে হয়ে ওঠে স্ফীত ও ভয়ংকর। এগুলিকে স্থানীয় ভাষায় 'জোড়' বলে। জেলাটির সমতলভূমি বর্ষার জলে সিক্ত হলে ধানের চাষ হয়। একদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত—মাঝে মাঝে কালো কালো পাথরের সারি মাটির বুক থেকে উঁকি দিচ্ছে। আর এক দিকে শাল, কুল আর পলাশের বন। পলাশের লাল ফুল যখন ফোটে—সে এক দেখবার মত দৃশ্য।

পুরুলিয়া জেলাটির মাটিতে অভ্রের গুঁড়ো দেখতে পাওয়া যায়। বেলে পাথর আর শ্লেট পাথরের বেশ প্রাচুর্য আছে জেলাটিতে, কারণ এটি ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমির মধ্যেই পড়ে। পাঞ্চেৎ অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় আর বরাহভূমের আকরিক লৌহ দিয়ে স্থানীয় আদিবাসীরা আজও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বানায়।

পুরুলিয়া জেলায় আগে বেশ জঙ্গল ছিল। এখন সে জঙ্গল হাসিল হয়ে গেছে। তবু এখনও বাঘমুণ্ডী পাহাড়ে বাঘ, কাঁসাই তীরে চিতা, পঞ্চকোটে নেকড়ে, দলমা পাহাড়ে হাতীর দেখা মেলে। পুরুলিয়ার ১৫০ বিঘা বিস্তৃত সাহেব বাঁধে বুনো হাঁস, ডাক আর টিলের ভীড় জমে শীতকালে।

পশ্চিমবঙ্গের সর্ব পশ্চিম্ প্রান্তের এই জেলাটির কোন লিখিত ইতিহাস নেই। কোন শিলালিপি বা তাম্র শাসনের সন্ধানও আজো বিশেষ পাওয়া যায় নি। স্মরণাতীত কাল থেকে অঞ্চলটি যে অনার্য মানুষের বাসভূমি ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মুণ্ডা কূর্মী ভূমিজ, হো, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা আজও জেলাটিতে যথেষ্ট সংখ্যায় বসবাস করছে। এদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অবদান উপেক্ষণীয় নয়। আর্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি জেলাটিতে প্রবেশ করার অনেক আগেই জৈনধর্ম পুরুলিয়ায় প্রবেশ করেছিল। জৈন গুরু বা তীর্থঙ্কররা ধর্মপ্রচারের জন্য বঙ্গদেশকে বেছে নিয়েছিলেন। বৌদ্ধরা কিন্তু বিহার আর কোশল দেশেই প্রথম ধর্ম প্রচারে নামেন। রাঢ় দেশে জৈনগুরুদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল।

পুরুলিয়ার ভেতর দিয়েই জৈনগুরুরা বাংলা দেশে প্রবেশ করেছিলেন। পুরুলিয়ায় যাঁরা প্রথম জৈনধর্মে দীক্ষিত হন তাঁদের বংশধররা আজও জেলাটিতে 'শরাক' নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'শ্রাবক' কথাটি থেকে 'শরাক' শব্দটির উৎপত্তি। শ্রাবক কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ a hearer অর্থাৎ যিনি শুনে থাকেন। মনে হয় এই শরাক থেকে সারোগী উপাধিটির সৃষ্টি হয়েছে।

এই শরাকরাই জেলাটির প্রাচীনতম বাসিন্দা। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তৈরী করা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজো পারা বড়ম্ প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়। এদের পরে আসে ভূমিজরা। এদের হাতে একজন জৈনতীর্থঙ্কর নিগৃহীত হন। সেই নিগৃহীত

তীর্থঙ্কর পাকভীরা গ্রামে আজও পূজিত হচ্ছেন। কয়েক শতাব্দী ধরে শরাক আর ভূমিজরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করে। এরপর এল আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রোত।

সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত শরাকরা ব্রাহ্মণদের প্রভাবে থাকে। এর পরের পাঁচ ছ'শ বছর ধরে ভূমিজদের সঙ্গে শরাকদের যে দ্বন্দ্ব বাধে তাতে পরাক্রমশালী ভূমিজদের কাছে তাদের হার মানতে হয়। শরাকরা ক্রমে সামাজিক কর্তৃত্ব হারিয়ে তাঁতের কাজ গ্রহণ করে। পুরুলিয়া জেলায় আজো তারা এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে টিকে আছে। ভূমিজরা সপ্তদশ শতকের মধ্যেই পুরুলিয়া অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করে। এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনের দখল নিয়ে মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে কলহ চলেছে। খাজুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাদশাহ পুত্র সুজা পুরুলিয়ার মধ্যে দিয়েই পলায়ন করেন।

মুসলমান আমলে এ অঞ্চলটিকে ঝাড়খণ্ড বলা হত। এই ঝাড়খণ্ড পথেই শ্রীচৈতন্যদেব একবার নীলাচল পথে যাত্রা করেছিলেন। সে রাস্তাটি আজ অহল্যাবাঈ রোড নামে পরিচিত। এই ঝাড়খণ্ড পথেই বাংলার সুবাদার আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ মেদিনীপুরের দিকে সৈন্য চালনা করেছিলেন। তিনি পুরাতন পথটি মেরামতও করেছেন।

এর পর একশ বছরের বেশী ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসীরা এই অঞ্চলটির ওপর প্রভুত্ব করে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিদেশী বণিক ইংরেজের করায়ত্ত হয় বাংলাদেশ। সিংভূম, মানভূম, ধলভূমের আদিবাসী রাজা আর সর্দাররা সহজে ইংরেজের কর্তৃত্ব মেনে নেননি। কৈলাপাল-এর জায়গীরদার সুবলা সিং, ঘাটশীলার জগন্নাথ ধল, চুয়াড়-সর্দার শ্যাম গঞ্জান বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ঝালদার জমিদাররাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বড়ভূমের লাল সিং, কিষাণ পাতর প্রভৃতি সর্দাররা বিদ্রোহী হলে পাইকরাও তাদের

সঙ্গে যোগ দেয়। ইংরেজরা ঝালদা-রঘুনাথপুর রোডের ওপর মিলিটারী ক্যাম্প বসিয়ে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে।

১৮৩২ সালে ভূমিজ আর কোল আদিবাসীরা বিদ্রোহ করে, ঘাটোয়ালরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কারণ আর কিছু নয় এই আদিবাসীরা বহু শত বছর ধরে অরণ্য অঞ্চলের স্বাধীন অধিকারী। ইংরেজরা এদের সেই স্বাভাবিক অধিকার থেকে বিচ্যুত করে। জঙ্গলের কাঠ কাটা কি পশু শিকার করার জন্য খাজনা ধার্য করে। তাই জ্বলে ওঠে আগুন। পুরুলিয়ার কাছে চাকুলতোড়ে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে আদিবাসী বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ ঘটে।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আমলে পুরুলিয়ার সিপাহীরা ক্ষেপে উঠে খাজাঞ্চীখানা লুঠ করে। স্থানীয় সাঁওতালরাও বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য উত্তেজিত হয়। তারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ১৮৬৯ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ইংরেজদের শঙ্কিত করে তোলে। একশ বছরেরও বেশী কাল ধরে চেষ্টা করেও বৃটিশরাজ স্বভাব-স্বাধীন আদিবাসীদের দমন করতে সমর্থ হয়নি।

এই আদিবাসীদেরই অনার্য-সংস্কৃতির সঙ্গে জৈন বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রণে পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। অধিবাসীরা ধীরে ধীরে উগ্রতা ত্যাগ করে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে ক্রমশঃ বিপুল হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এরা যে ভাষায় আজ কথা বলে তা আর্য ভাষা গোষ্ঠীরই এক ঐশ্বর্যশালী ভাষা বাংলা। অবশ্য পুরুলিয়াবাসীদের মৌখিক বাংলা ভাষার স্থানীয় নাম "রাঢ়ীবোলি।" এই আদিবাসীদের মধ্যে কূর্মীরা হিন্দু সমাজের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। এরা সুপ্রাচীন দ্রাবিড়দের বংশজাত। এরা হিন্দু দেবতা পূজার সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকে বটে কিন্তু পারিবারিক বিবাহ বা সামাজিক পূজা পার্বণে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করে না। সাধারণতঃ কৃষিই এদের উপজীবিকা। এদের সর্দারদের মাহাতো বলা হয়।

সাঁওতালরা প্রায় সারা জেলাতেই ছড়িয়ে আছে। এদের সর্দারকে মাঝি বলে ডাকা হয়। কয়লাখনির কাজ সাঁওতাল শ্রমিক ছাড়া চলে না বললেই হয়।

মুণ্ডারা, ভূমিজদের পাশাপাশি অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। জেলাটিতে ভূমিজদের প্রতিপত্তি এককালে খুবই ছিল। আজও ভূমিজ আর মুণ্ডাদের দেবতা 'সিং বোঙ্গার' পূজা বেশ ঘটা করেই উদ্‌যাপিত হয়। এই 'সিং বোঙ্গা' আকাশের দেবতা সূর্য। এঁর প্রীতির জন্য ভূমিজ আর মুণ্ডারা মুরগী ও মদ উৎসর্গ করে থাকে। মুণ্ডা আর সাঁওতালরা আর একটি দেবতার পূজা করে থাকে। সেটির নাম "মারাংবুরু"। এটি একটি বড় পাহাড়ের আত্মা। এঁর উদ্দেশ্যে মহিষ উৎসর্গ করা হয়।

এরা ছাড়া বাউরীরা রয়েছে। এরা পাল্কী বেহারার কাজও করতো এককালে। এখন কৃষিকার্যে মন দিয়েছে। এই আদিবাসীদের উৎসব সারা জেলায় প্রায় সারা বৎসর ধরে প্রাণ সঞ্চার করে রাখে।

কূর্মীদের করম উৎসব হয় ভাদ্র মাসে। গ্রামের তরুণ-তরুণীরা বন থেকে একটা গাছের ডাল কেটে আনে। ডালটিকে মাটিতে পুঁতে ফুল আর আলো দিয়ে সাজায়। রাত্রে উৎসব হয়। সারারাত ধরে চলে নাচ আর গান। সকালে গাছের ডালটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। মনে করে গাঁয়ের অপদেবতা বিদায় নিল। বৈশাখে নববর্ষ উৎসবে ফুল আর মুর্গী উৎসর্গ করা হয়। সাঁওতাল আর ভূমিজরা মদ খেয়ে নাচে। কূর্মীরা কিন্তু মদ খায় না।

পৌষ মাসের টুসু পরবকে বলা চলে কুমারী মেয়েদের উৎসব। সারা মাস ধরে কুমারী মেয়েরা একটা আল্‌পনা দেওয়া মাটির পাত্রে খুঁটের গোলা তৈরী করে রাখে। মাসের শেষে স্নান করে শুচি হয়ে সেই ঘুঁটেতে আগুন দেয়। তারপর পিঠা উৎসবে যোগ দেয়। টুসু পরবের উদ্দেশ্য কুমারী মেয়েদের ভাল স্বামী আর ঐশ্বর্য লাভ।

ভাদ্রমাসের শেষদিনে হয় ছাতা পরব। ধানের স্তূপের ওপর গাছের ডাল পুঁতে তার ওপর বাঁশের লাঠির বিশাল ছাতা ফুল দিয়ে সাজান হয়। ঘোড়ায় চড়ে স্থানীয় রাজা বা সর্দার এলে তবে ছাতা খোলা হয়। আষাঢ় মাসে সাঁওতালদের বিখ্যাত জাঁকাল পরব। নতুন ওঠা ফল দান করা হয় এ পরবে।

এইসব লোক-উৎসব ছাড়াও পুরুলিয়ার ঝুমুর গান ও কীর্ত্তন বিখ্যাত। পুরুলিয়ার লোকনৃত্য 'ছউ' এর খ্যাতিও রয়েছে। রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনীকে নৃত্যের মাধ্যমে রূপদান করেন মুখোশ-ধারী নর্তক অভিনেতাগণ।

পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতি নানাভাবে পুষ্ট হয়েছে অনেক শতাব্দী ধরে। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে মুণ্ডারী, ভূমিজ, সাঁওতালদের দ্রাবিড়-সংস্কৃতির ধারা। বোধপুর, বড়ম, পারায় জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যেমন দেখা যায়, তেমনি দালমী চাকুলতোড়ে, তেলকুপীতে ভগ্ন মন্দিরের ভাস্কর্যে জৈনদের পর বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবও পড়েছে। দালমী ও পাবনাপুর পরবর্তীকালে ভূমিজদের দ্বারা ধ্বংস হয়।

পুরুলিয়ার কাছে কাঁসাই নদীর তীরে ভগ্ন মন্দিরটিতে মিশরীয় ভাস্কর্যের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একটি মূর্তি আছে মন্দিরে—মনে হয় এটি জৈনতীর্থঙ্করের।

কাঁসাই নদী তীরে বড়ামে তিনটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলিও আগে জৈনমন্দির ছিল। মন্দিরের গায়ে একটি রাজ-হংসের প্রতীক চিহ্ন দেখে অনেকে বলেন এটি বৌদ্ধদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। কিছু দূরে একটা শিবের মন্দিরও রয়েছে। কাছেই দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে সিংহে উপবিষ্টা পার্বতীমূর্তি। গণেশ-কোলে পার্বতীমূর্তিও একটি পাওয়া গেছে। কাঁসাই নদীতীরে বোধপুরে একটি শিবমন্দির আছে, দেখতে অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত।

পারায় অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলো শরাকদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি। এগুলোর মধ্যে নরম পাথরের তৈরী মন্দিরটি ভাস্কর্যে অতুলনীয়। রাজা মানসিংহ এটিকে সংস্কার করান বলেই এতদিন টিকে আছে।

মন্দিরের কিছু দূরেই একটি পাথরের পিলার দেখা যায়। এটি নাকি রঙ্কিণী দেবীর তৈরী। এই দেবী নরমাংস-ভোজী। এই পাথরের পিলারে মাংস কুটে খেতেন এই রাক্ষসী দেবী। স্থানীয় রাজার সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল রোজ একজন করে মানুষ পাঠাবে তাঁর আহারের জন্য। রাজা একদিন এই নিষ্ঠুর ব্যাপার কেমন করে বন্ধ করবেন ভেবে অশ্রু বিসর্জন করছেন। এমনি সময় এক রাখাল স্বেচ্ছায় রাজার অনুমতি নিয়ে রঙ্কিণী দেবীর কাছে গেল। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল লোহার দানা, আর মটর দানা। রঙ্কিণী দেবীর কাছে গিয়ে বললো—দেখ আমার শক্তি। বলে লোহার মটর দানাগুলো দেবীকে দিয়ে তাঁর সামনেই আসল মটর দানাগুলো খেতে লাগলো কড়মড়িয়ে। দেবী তো ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে পালাতে লাগলেন। শেষে ধলভূমে পৌঁছে এক রজকের বাড়ীতে গিয়ে লুকালেন। এদিকে রাখাল দুটো কুকুর নিয়ে দেবীকে খুঁজতে বেরুলো। এদিকে দেবীর কৃপায় রজক হলেন রাজা। সেই রাজা রঙ্কিণী দেবীর মন্দির তৈরী করে দেন। দেবীর কোপে রাখাল আর তার কুকুর দুটো পাথরে পরিণত হ'ল। রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরে নরবলি হ'ত। ইংরেজ আমলে সেই মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়।

এমনি কত কাহিনী কত কিংবদন্তী পুরুলিয়ার সুপ্রাচীন গ্রাম নগরগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দালমীতে নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের দুর্গ ছিল। তিনি এখানকার দীঘিতে স্নান করার আগে দামোদর তীরে এক জায়গায় গায়ে তেল মাখতেন। জায়গাটার নাম তেলকুপি। এখানে একটা বিরাট

গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও দুর্গার মূর্তিগুলো দেখে মনে হয় প্রাচীন জৈনধর্ম-সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে ফেলেছে হিন্দু আর্যধর্ম।

দালমীর পাবনাপুরের মন্দির ও দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। সেটা হচ্ছে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-সংস্কৃতি পুরুলিয়ার প্রাধান্য বিস্তার করলেও স্থানীয় পরাক্রমশালী ভূমিজরা তা সহজে মেনে নেয়নি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই, জৈনতীর্থঙ্করদের প্রচেষ্টায়ই মানভূম তথা পুরুলিয়া অঞ্চল একদিন আর্য-সংস্কৃতিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

পুরুলিয়া শহরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাকভীরা গ্রামে জৈনতীর্থঙ্করের সাড়ে সাত ফুট দীর্ঘ উলঙ্গ মূর্তি—জৈন-স্থাপত্যের এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। সহস্র নিগ্রহ সহ্য করেও জৈনগুরুরা একদিন স্থানীয় মানুষদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হন। পরে অবশ্য শিবরূপে এঁরা এ অঞ্চলে পূজা পাচ্ছেন। জৈন ও ব্রাহ্মণ্য-ভাস্কর্যের অনুপম উদাহরণরূপে আজও দাঁড়িয়ে আছে পুরুলিয়ার সাত মাইল দক্ষিণে চাকুলতোড়ের দেউল দুটি।

সুবর্ণরেখা তীরে সাফারণ নামক স্থানটিকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের এক বিস্ময়কর কাহিনী লুকিয়ে আছে। চীনা পর্যটক হুয়েন সাং-এর বিবরণীতে Kirana Safalana বলে একটি নগরীর উল্লেখ আছে। সেটি নাকি রাজা শশাঙ্কের রাজধানী। এই কি-র-ণ স-ফ-লা-নাই পুরুলিয়ার সাফারণ গ্রাম বলে অনেকে মনে করেন। কি-র-ণ স-ফ-লানার সঙ্গে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উচ্চারণ ধ্বনির মিল আছে।

বরাকর আর দামোদর নদের সঙ্গমে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেৎ। এখানে পঞ্চকোটের রাজার প্রাসাদ আর দুর্গ ছিল। বারো বর্গ-মাইলের এই বিশাল দুর্গের পাঁচটি তোরণ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

এই ভাঙা দুর্গের ভেতর পাওয়া গেছে দুটো মন্দির—সেগুলোর গায়ে টেরাকোটা টালীর পোড়ামাটির কারুকার্য। এগুলো মুসলমান যুগের বলেই মনে হয়। কারণ একটা মন্দিরের গায়ে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বীরের নাম লেখা আছে।

পঞ্চকোট রাজবংশের উৎপত্তি নিয়ে বেশ একটা চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে। অনন্তলাল আর তাঁর পত্নী তীর্থযাত্রা করেছিলেন। পথে হ'ল তাঁদের এক পুত্রের জন্ম। তীর্থযাত্রায় বিঘ্ন হবে বলে তাঁরা সদ্যোজাত পুত্রকে ত্যাগ করে গেলেন। পথের ধারে পরিত্যক্ত ক্রন্দনরত শিশুকে কপিলা গাই তাঁর দুধ দিয়ে বাঁচালেন। স্থানীয় আদিবাসীরা ছেলেটিকে মানুষ করে তাদের সর্দার করে নিল! পরে চৌরাশী পরগণা দখল করে তার রাজা করলো তাকে। এক বিশাল দুর্গও নির্মাণ করে দিল।

এই দুর্গটি ছিল ছোট ছোট পাঁচটি দুর্গের সমান। অথবা পাঁচজন রাজার ওপর এখানকার রাজা কর্তৃত্ব করেছিলেন বলে স্থানটির নাম হ'ল পঞ্চকোট।

আদ্রা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে রঘুনাথপুরের নিকট একটা ছোট খাড়া পাহাড় আছে—সেটির নাম ফাঁসীপাহাড়। এর ওপর থেকে পঞ্চকোটের রাজার শত্রুদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত।

রঘুনাথপুরের তসর এককালে খুব বিখ্যাত ছিল। এখানকার রেলওয়ে ষ্টেশনের গুরুত্ব কমতে আরম্ভ করে যেদিন আদ্রায় রেলওয়ে ষ্টেশন খোলা হয়। আদ্রা আজ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের একটা প্রধান ও কর্মবহুল রেলওয়ে ষ্টেশন।

পুরুলিয়ায় শাল, পলাশ, কুল গাছের বন থাকায় লাক্ষাকীট পালন করার সুবিধা আছে। লাক্ষাকীট থেকে গাছের ওপর জমাট লাক্ষা পাওয়া যায়। ঝালদা, বলরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে লাক্ষা থেকে গালা তৈরী করার জন্য কারখানা তৈরী হয়েছে।

জেলার সদর পুরুলিয়া। ১৮৩৮ সাল থেকেই এটা মানভূমের সদর ছিল। ১৮৫৫ সালে এখানে একটা ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় অবশ্য তারও আগে থেকে এখানে সংস্কৃত পঠনপাঠনের জন্য টোল ছিল, তবে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধর্মান্তকরণের কাজও চালাতেন। তাই পুরুলিয়া, ঝালদা ও বাঘমুণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে নেটিভ খ্রীস্টানদের দেখা মেলে। ১৮৯৮ সালে পুরুলিয়ায় একটি চার্চও তৈরী হয় নেটিভ খ্রীস্টানদের সুবিধার্থে।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে এত বেশী সংখ্যায় দেশীয় খৃষ্টান আর কোথাও নেই। তবে খৃষ্টান-মিশনারীরা পুরুলিয়াতে একটা কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জেলাটির এক মহা উপকার সাধন করে গেছেন। রাঁচী রোডের ধারে মহাপ্রাণ জার্মান-মিশনারীদের এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি আজো দুঃখী আতুর মানুষের এক মহা ভরসা স্থল।

জেলাটি ঐতিহাসিক ও ধর্ম-সংস্কৃতির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বহু বছরের আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে শান্তির অভাবে জেলাটির প্রগতি যথোচিত হতে পারে নি। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ তৈরী ও সেচের সুব্যবস্থার জন্য দুরন্ত দামোদরে বাঁধ দেয়া হ'ল। তৈরী হ'ল আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী কর্পোরেশনের (টি, ভি, সি) অনুরূপ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি, ভি, সি)। দামোদর নদের ওপর তৈরী হয়েছে পাঞ্চেৎ বাঁধ। বাঁধটি অবশ্য বিহারে। বন্যা হল নিয়ন্ত্রিত। উত্তম সেচ ব্যবস্থার ফলে চাষের হল সুবিধা আর জল-বিদ্যুতের আলোয় জেলার অনেক গ্রাম নগর হয়ে উঠলো আলোকিত।

সম্প্রতি তেলকুপির কাছে সাঁওতালডিতে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ শেষ হবার মুখে। এটি হবে এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ থার্মাল

প্রজেক্ট প্ল্যাণ্ট। এটা সফল হলে পুরুলিয়া জেলার শিল্প সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে। কংসাবতীর উপর বাঁধ দেওয়া সুরু হয়েছে। এটা হলে পুরুলিয়া জেলা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। জেলাটি আজ সাফল্য ও সমৃদ্ধির জয়-তোরণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক কালে জেলাটি একজন অক্লান্ত কর্মী ত্যাগব্রতী মানুষের কর্মক্ষেত্ররূপে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইনি অতুলচন্দ্র ঘোষ। স্বাধীনতা লাভের পর মহাত্মা গান্ধী তাঁর কর্মীদের বলেছিলেন ক্ষমতার লোভ না করে লোক-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। তাঁর কথা সেদিন নেতৃস্থানীয়দের কেউ কানে নেন নি। শুধু অতুলচন্দ্র পুরুলিয়ার মত পশ্চাৎপদ একটা জেলাকে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়ে এখানে গড়ে তোলেন লোকসেবক সংঘ ১৯৪৯ সালে। লোকসেবক সংঘের সহকর্মীরূপে পান নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তকে। অতুলচন্দ্র ও নিবারণচন্দ্র দুজনেই আজ মৃত। কিন্তু তাঁদের হাতেগড়া লোকসেবক সংঘের কর্মীরা তাঁদের লোকসেবার কাজ আজও চালিয়ে যাচ্ছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে।

৭



কলকাতাকে বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট জেলা হাওড়া। 'হাওড়' মানে ঝিল বা নিচু জলাভূমি। জেলাটাতে ঝিল বা জলার অভাব নেই। তাই বোধ করি জেলাটির নাম হয়েছে হাওড়া।

হাওড়ার উত্তরদিকে হুগলী জেলা, পশ্চিমে মেদিনীপুর, পূর্ব আর দক্ষিণদিক দিয়ে বয়ে গেছে হুগলী আর রূপনারায়ণ নদী। জেলার মাঝখান দিয়ে দামোদর নদ প্রবাহিত। বিখ্যাত সরস্বতী নদী ত্রিবেণীর কাছ থেকে হুগলী নদী থেকে বেরিয়ে আবার হুগলী নদীতেই মিশেছে।

জেলাটির সমতলভূমি নদীর পলি দিয়েই তৈরী। তাই হাওড়ার মাটি বড় উর্বর, ধান আর পাটের ফসল হয় ভালই। কিন্তু বাণিজ্য-কেন্দ্র কলকাতার একান্ত কাছে হওয়ায় শিল্প শহর কলকাতার প্রভাব পড়েছে তার ওপর। হুগলী নদীর ধারে উত্তরে ত্রিবেণী—কাঁচড়াপাড়া থেকে দক্ষিণে উলুবেড়ে বজবজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে হাওড়ার স্থান অনেক ওপরে।

হাওড়ায় প্রথম যে কারখানা তৈরী হয় তা বোধ করি ভগ্নপোত মেরামতের কারখানা। হাওড়ার বেতড় বন্দরে একদিন জাহাজের

ভীড়ে নদীর জল দেখা যেত না। তখন থেকে হাওড়ায় জাহাজ তৈরীর ব্যবস্থা ছিল—সে তো অনেক কালের কথা। আধুনিককালে প্রায় দুশো বছর আগে এক বিদেশী বণিক এই জাহাজ মেরামতের কারখানা বসান। এখন অনেকগুলো জাহাজ সারাইএর কারখানা বসে গেছে। তারপর বালিখালের ধারে সারি সারি চিনির কারখানা তৈরী হয়েছে। এই বালির কাগজের কারখানার 'বালি কাগজের' চাহিদা ছিল সারাদেশে। কাপড়ের কল, লোহার কল, আর চটকল একের পর এক তৈরী হয়ে হাওড়াকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প শহরে পরিণত করেছে। লোহা আর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার জন্য সারাদেশে হাওড়ার খ্যাতি।

হাওড়ার চটকল বিখ্যাত। একশ বছরেরও বেশী হয়ে গেল হাওড়ায় প্রথম চটকল তৈরী হয়। ভারতবর্ষের পাট শিল্পের বেশীর ভাগ এখানেই উৎপন্ন হয়।

হাওড়ায় কাপড়ের কল বসেছে বেশ কয়েকটা, গেঞ্জী তৈরীর কলও হয়েছে। রেশমের কলও চলছে। রঙের কল, সাবানের, কাচের আর রবারের কারখানাগুলো বেশ ভালই চলছে। নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাও খোলা হয়েছে হাওড়ায়। সিগারেটের কারখানাও বাদ যায়নি। এই কারখানার আধিক্যের জন্যই হাওড়াকে বলা হয় বাংলাদেশের 'গ্লাসগো'। হাওড়ার কাছেই লিলুয়ায় রয়েছে রেলের বিখ্যাত কারখানা।

বর্তমান হাওড়ার শিল্পসমৃদ্ধ রূপের পেছনে এক গৌরবদীপ্ত অতীত ইতিহাসও আছে। সে কথাগুলো না বললে হাওড়ার কথা সম্পূর্ণ হবে না।

অনেকদিন আগের কথা তখন বাংলাদেশের সেরা বন্দর তাম্রলিপ্তের গৌরব অস্তমিত। সরস্বতী নদীর ধারে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি তখন চরম শিখরে। সেই সময় হিজলী আর হাওড়ার বেতড় বন্দরের সুবর্ণ যুগ।

ভাগীরথী তীরের বেতড়েই প্রথম পর্তুগীজ বণিকদের ঘাঁটি তৈরী হয়। বেতড় বন্দরে তখন দেশ-বিদেশের বাণিজ্য জাহাজ আসত ভীড় করে। বাঙালী বণিকেরাও হুগলী নদীর পথেই সুদূর সিংহল, যবদ্বীপের সুমাত্রা, বলী দ্বীপ আর চম্পারাজ্যের দিকে যাত্রা করতেন। চাঁদ সওদাগর তাঁর বাণিজ্যের ডিঙা নিয়ে সমুদ্র যাত্রা পথে আড়িয়াদহ, ঘুসুড়ী হয়ে বেতড় বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকে লেখা বিপ্রদাস পিপলাই-এর পুঁথিতে বেতড়ের নাম আছে।

বাংলাদেশের অতি প্রাচীন আর সংস্কৃতি সমৃদ্ধভূমি হাওড়া। হাওড়া আর হুগলীর মিলিত ভূভাগের অনেকখানি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দিল্লীর বাদশাহ আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় ভুরশুটের পরগণার রাজস্ব ছিল বিশ লক্ষ টাকা। অঞ্চলটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল বলে অনেক ধনী শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল এ অঞ্চলে। তাই জায়গাটার নাম হয়েছিল ভুরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট। অঞ্চলটাতে প্রাধান্য ছিল রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের।

কেমন করে এ অঞ্চলে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি হল সে ইতিহাস আজ আর সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা যায়—সপ্তম বা অষ্টম শতকের কাছাকাছি সময় থেকেই ভুরিশ্রেষ্ঠের অভ্যুদয়। গৌড়ের সিংহাসনে তখন পালরাজারা রাজত্ব করছেন। এ রাজ্যের রাজা যে কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে মনে হয় রবংশের কেউ এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। একজন ধীবর জাতীয় রাজাও কিছুদিন এ অঞ্চলের রাজা ছিলেন বলে জানা যায়। পাণ্ডুদাস বলে একজন কায়স্থ রাজা ভুরশুট রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তারপর চতুরানন মহানিউগী বলে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ভুরশুটের অধীশ্বররূপে দেখা যায়। তখন গৌড়ের সিংহাসনে বিখ্যাত হুসেনশাহ। পরবর্তীকালে হুগলী আর সরস্বতী

নদীর ধারের বাণিজ্য সমৃদ্ধ গ্রামগুলোয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। ততদিনে হুগলীতে মুসলমান নবাবদের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। কর্মসন্ধানেও বহু মানুষ হাওড়া হুগলী অঞ্চলে ভীড় করছে।

আকবর যখন দিল্লীর বাদশাহ তখন দেখা যায় কৃষ্ণরায় ভুরশুটে রাজত্ব করছেন। ইনি চতুরাননের দৌহিত্র বংশের সন্তান। এই রাজবংশ ভুরশুটে প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে বর্ধমান অঞ্চলে এক পশ্চিমাগত ভূস্বামী বংশের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ। ছলে বলে কৌশলে এঁরা জমিদারী বাড়িয়ে চলেছিলেন। এঁদেরই একজন কীর্তিচন্দ্র ভুরশুটের রাজবংশকে উচ্ছেদ করে ভুরশুট পরগণা দখল করেন। তখন বাংলাদেশের জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় শুরু হয়েছে। মোগল শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ইংরেজ বণিকশক্তির অভ্যুদয় ঘটছে। এরই মধ্যে ভুরশুটের রাজ্যহারা এক রাজকুমার নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় পান। তিনি কবি ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁকে রায়গুণাকর উপাধি দেন।

সম্রাট শাহজাহানের আমলে ভুরশুটের জমিদার প্রতাপনারায়ণ 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভুরশুট রাজ্যের তিনটি গড় ছিল—তার মধ্যে গড়ভবানীপুর সবচেয়ে প্রাচীন। তবে এখন সে গড়ও প্রায় বুজে গেছে। শুধু একটা অতি প্রকাণ্ড জীর্ণ ইটের মন্দির ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে।

ভুরশুটের দ্বিতীয় গড় পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। এই পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া গ্রামে রাজা কৃষ্ণরায়ের পুত্র বসন্তরায় বাস করতেন। তাঁর নামেই গ্রামের নাম হয়েছে বসন্তপুর। এই বসন্তরায়ের বংশেই কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম। পলাশীর যুদ্ধ আর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু প্রায়

সমসাময়িক ঘটনা। এর পর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। সে অধ্যায় যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি চমকপ্রদ।

হাওড়ার ভোটবাগান ইতিহাসের এক বিচিত্র কাহিনী আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। তিব্বত বা ভুটিয়াদের বলা হয় ভোট। ভোটবাগানের মঠে আর্যতারা, মহাকাল ভৈরব, বজ্রভ্রূকুটি প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায় অথচ মঠটি পরিচালনা করেন দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা। এঁরা আবার তারকেশ্বর মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। দুশো বছরেরও আগে ভুটান রাজার সঙ্গে কোচবিহারের রাজার যুদ্ধে ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সৈন্য পাঠিয়ে কোচবিহাররাজকে সাহায্য করেন। ফলে ভুটানরাজের পরাজয় ঘটে। পরাজিত হয়ে ভুটানরাজ তিব্বতের পাঞ্চেন লামার শরণাপন্ন হন। ভুটানরাজ পাঞ্চেন লামাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন মধ্যস্থ হয়ে কোচবিহাররাজের সঙ্গে একটা সন্ধির ব্যবস্থা করে দেন। পাঞ্চেন লামা তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে দুজন দূত পাঠান। তার মধ্যে একজন তিব্বত দেশীয় রাজকর্মচারী পাইমা আর একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, নাম পুরাণগিরি এই পুরাণগিরি কে, তিনি তিব্বতেই বা গেলেন কেন—সে আর এক ইতিহাস।

শোনা যায় এই পুরাণগিরির আদি নিবাস কান্যকুব্জে। মাত্র ন' বছর বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করেন। তারপর সারা ভারত পর্যটন করে মধ্য এশিয়ার তুষার মরু অতিক্রম করে রুশিয়ার রাজধানী মস্কো পর্যন্ত গমন করেন। চতুর হেষ্টিংস সাদরে তিব্বতের দূতদ্বয়কে গ্রহণ করেন। ভুটানের সঙ্গে সন্ধিপত্রে সাক্ষরও করেন।

বণিক ইংরেজের প্রতিনিধি হেষ্টিংস তখন তিব্বত আর ভুটানের বিলাতী পণ্যের বাজারের খোঁজ পেয়েছিলেন। এই মতলব হাসিল করার জন্য তিনি পাঞ্চেন লামার কাছে এক বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল পাঠান। সে দলে জর্জ বোগলে, ডাঃ হ্যামিলটন ছাড়া শৈব-

সন্ন্যাসী পুরাণগিরি গোঁসাইয়েরও ঠাঁই হয়েছিল। এই বাণিজ্য-মিশন সাফল্যযুক্ত হয়। পুরাণগিরির কাজের দক্ষতায় হেষ্টিংস-এর বিশ্বাস গভীরতর হল। এবার হেষ্টিংস স্থির করলেন পুরাণগিরিকে ব্রিটিশরাজের কূটনৈতিক দূত করে তিব্বতে পাঠাবেন। ব্যবস্থা সব পাকা। ১৭৮৫ সালে হেষ্টিংস হঠাৎ পদত্যাগ করে বিলাত যাত্রা করেন। পরবর্তী বড়লাট ম্যাকফার্সন সাহেব পুরাণগিরিকে তিব্বত পাঠিয়েছিলেন।

এখন বলি কেমন করে ভোটবাগানের জন্ম হল। তিব্বতে যে প্রথম বাণিজ্য মিশন প্রেরিত হয়েছিল সে দলে ছিলেন জর্জ বোগলে নেতা হিসাবে। এঁর কাছে পাঞ্চেন লামা প্রস্তাব করেন গঙ্গাতীরে তাঁরা একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তিব্বতী লামারা ভারততীর্থ পর্যটন করতে গিয়ে যেন একটা আশ্রয় পান। এ ব্যাপারে ইংরেজ প্রতিনিধি হেষ্টিংস যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। মঠের স্থান যেন বাংলা দেশে আর কলকাতার কাছেই হয়। কারণ বাংলা দেশের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু শতাব্দীর আর কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, কাজেই ব্যবসা বাণিজ্যের কথাবার্তা চালানোর জন্য কলকাতার কাছাকাছি মঠ হলে সুবিধা হবে। হেষ্টিংস এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। পাঞ্চেন লামা ও পুরাণগিরিকে ঘুসুড়ীর কাছে হাওড়ায় ১৫০ বিঘার মত জমি দিলেন মঠ আর মন্দির তৈরী করতে। আজও ভোটবাগানের মঠে পাঞ্চেন লামাকে দেওয়া ফার্সী ভাষায় লেখা জমির সনদে হেষ্টিংসের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়।

হেষ্টিংস-এর আমলেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘাঁটি দৃঢ়মূল হয়। হুগলী থেকে তাড়া খেয়ে জব চার্ণক ভাগীরথীর তীরে ক্ষুদ্রপল্লী কলকাতায় বাণিজ্য কুঠি তৈরী করেন। তার ক'বছর পরে ১৭১৪ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর অনুমতি নিয়ে ইংরেজ বণিকেরা গঙ্গার ওপরে সালকিয়া আর হাওড়ায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। হাওড়ার

বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা লুঠতে থাকে ইংরেজ বণিকেরা। ক্লাইব গেলেন, এলেন হেষ্টিংস। প্রায় তাঁরই আমলে হাওড়ার শিবপুরে হুগলী নদীর ধারে বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরী হয়। ১৭৮৭ সালে শিবপুরের কাছে গঙ্গারধারে একখণ্ড জমি নিয়ে গর্ডেনটার সূত্রপাত হয়। পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের গাছপালা এখানে লাগানো হয়েছিল। এখানে একটা বিরাট বটগাছ আছে, তার বয়স নাকি দুশো বছরেরও বেশী। আসল গাছটি এখন আর নেই। তার অসংখ্য ঝুরিই এখন বটগাছটাকে সাজিয়ে রেখেছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। নানা স্থান থেকে দলে দলে লোক এখানে বেড়াতে আসেন। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বোটানিক্যাল গার্ডেন রূপে সারা বিশ্বে এর খ্যাতি আছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছেই শিবপুরে আছে পশ্চিম বঙ্গের সুবিখ্যাত বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। শিবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খ্যাতি অনেক দিনের। এই কলেজ থেকে পাশ করে বাংলাদেশের অনেক প্রতিভাবান ছাত্র পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। আগে কলেজটি ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের বাড়িতে। তখন কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন সেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাঠ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ বাড়িতে স্থানের অকুলান হওয়ায় শিবপুরে পুরাতন খ্রীষ্টান বিশপস্ কলেজের গৃহে শিবপুর বি, ই, কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশপস্ কলেজে অধ্যাপনা করতেন প্রখ্যাত পণ্ডিত হিন্দু কলেজের বিপ্লবী অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র, ইয়ং বেঙ্গলদের অগ্রগণ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই কলেজে ছাত্ররূপে নানা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শিবপুরের এক ভাড়া বাড়িতে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন বাস করে গেছেন। শিবপুর নামটিকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়েছেন

বিখ্যাত রস-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বরযাত্রী' গ্রন্থে গণশা, ঘোৎনা, গোরাচাঁদ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে।

হাওড়া জেলার কথা বলতে গিয়ে হাওড়া রেলস্টেশনের কথা ভুললে চলবে না। হাওড়া স্টেশনটি শুধু ভারতবর্ষের নয় সারা এশিয়ার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ কর্মচঞ্চল রেলস্টেশন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গাড়িগুলি এখান থেকে ছেড়ে চলে যায় সুদূর কাশ্মীরের পাঠানকোটে কিংবা সুদূর দাক্ষিণাত্যের তামিলনাড়ু অথবা ভারত-সাগর চুম্বিত কেরল রাজ্যের দিকে। হাওড়া রেলস্টেশনকে তাই পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

এই পথে আসে তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ভাষাভাষীর দল; আসে সিন্ধী, কচ্ছী, রাজস্থানী বণিকবৃন্দ কলকাতার স্বর্ণখনিতে। হুগলী নদীর বুকের উপর সুবিপুল হাওড়া সেতু হাওড়াকে কলিকাতা নগরীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সেতুটি কারিগরি শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন। কোন থামের ওপর সেতুটি ভর দিয়ে নেই, এটি দোলনার মত পিচে ঢাকা মস্ত রাস্তাকে বুকে ধরে রেখেছে আর সেই পথ দিয়ে চলেছে ট্রাম, বাস, লরী, মোটর আর হাজার হাজার মানুষ।

হাওড়া জেলাটি আজ সারা ভারত তথা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার অন্যতম কারণ বেলুড়। গঙ্গার ধারে বেলুড়। বেলুড়ের এ্যালুমিনিয়ম কারখানার খ্যাতি আজ ভারত-ব্যাপী। এখানকার তৈরী এ্যালুমিনিয়ম পাত যায় বাঙ্গালোরের এয়ার ক্রাফ্‌ট্ কারখানায়। উড়োজহাজ তৈরীর কাজে লাগে সে সব পাত।

এই পরিচয়ের চেয়ে আরো বড় পরিচয় আছে বেলুড়ের। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সুবিখ্যাত মঠটি এখানে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ব ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সুদীর্ঘ চার বছর ধরে বক্তৃতা দিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ পান। সেই অর্থ এনে স্বামীজী রাখাল মহারাজকে

দেন। সেই অর্থেই কেনা হয় গঙ্গাতীরে জমি। সেই জমিতে তৈরী হয় বেলুড় মঠ। এই মঠ থেকে শুধু সারা ভারতের নয় সারা বিশ্বের রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা মঠগুলি পরিচালিত। বেলুড় মঠ বাঙালীর গৌরবের বস্তু। বেলুড় মঠের খ্যাতি আজ সারা বিশ্বব্যাপী। হাওড়ার শিল্প, হাওড়ার বিখ্যাত স্থান প্রভৃতির কথার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার বহুকালের প্রাচীন লোক-সংস্কৃতির কথাও স্মরণীয়। পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের দেখা পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতি সম্পন্ন গ্রামে। হাওড়ার গ্রামে গ্রামে তেমনি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের দেখা মেলে। ঘোড়ার পিঠে পঞ্চানন্দ উগ্রমূর্তিতে বসে আছেন। ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার গ্রামেও পঞ্চানন্দ হাজির হয়েছেন। অন্যান্য লোকদেবতার দেখা হাওড়ার গ্রামে মেলে না বললেই হয়। তবে দক্ষিণ রায় নামে এক লোক-দেবতার দেখা পাওয়া যায়। অনেকে বলেন ইনি নাকি ভুরশুট রাজবংশের কোন রাজা আপন কৃতিত্বে গ্রাম্য লোক-সমাজে দেবতা হয়ে বসেছেন। অবশ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা বলে পূজা পান। হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে যদি কোন দেবী লোক-দেবতা রূপে বেশী সমাদৃত হন তবে তিনি চণ্ডী। এই সব লোক-দেবতা ছাড়াও হাওড়া অঞ্চল যে একদিন শৈব প্রভাবে পড়েছিল তার বড় প্রমাণ গড়-ভবানীপুরের শৈব মঠ। তারকেশ্বরে যখন দশনামী গিরি সম্প্রদায়ের সাধুরা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, বোধ করি তখনই গড়-ভবানীপুরের প্রতিষ্ঠা হয়।

হাওড়া জেলার অতীতের মত বর্তমানও গৌরবে সমুজ্জ্বল। রূপনারায়ণ নদীর তীরে পাণিত্রাস সামতাবেড়ে গ্রামে গৃহ নির্মাণ করে দীর্ঘকাল বাস করে গেছেন বাংলার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চাকরির সন্ধানে একদিন শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখান থেকে দীর্ঘ ১৪ বছর পরে দেশে ফিরে বাসা বাঁধেন হাওড়ারই শিবপুর অঞ্চলে। সেখানে কাটে বেশ কয়েক

বছর। তারপর রূপনারায়ণের কোলে পাণিত্রাসে মাটির বাড়ি তৈরী করে সাহিত্য সাধনায় মন দেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম হাওড়ার বাণীপুরে। নন্দলাল বসু ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য। ভারতীয় শিল্পের নব-জাগরণের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলাল বসুর নামও সকলে চিরকাল স্মরণ করবেন। এই গুণী শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষক করে। আজীবন শিল্পসাধক নন্দলালের জীবনদীপ শান্তিনিকেতনেই সুপরিণত বয়সে নির্বাপিত হয়েছে সম্প্রতি। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, শিল্পে নন্দলাল বসু আর নাট্য-শিল্পসাধনা ও অভিনয় কলাক্ষেত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ী হাওড়ার গৌরব। শিশিরকুমারের জন্ম সাঁতরাগাছিতে। বাংলাদেশ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, সুরেন ঘোষের (দানীবাবু) মত প্রতিভাবান অভিনেতার জন্ম দিয়েছে। সেই ধারারই উত্তর সাধক শিশিরকুমার। বর্তমান ভারতবর্ষে এত বড় প্রতিভাবান নট আর জন্মাননি।

হাওড়া জেলাটি ক্ষুদ্র হলেও এর সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সাধনা মোটেই ক্ষুদ্র নয়। বাঙালীর জীবিকার ক্ষেত্র হিসেবে কলকাতার পরেই তার স্থান। অতীতে হাওড়ার সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়েও জেলাটির সাংস্কৃতিক সাধনার অগ্রগতি আজও অব্যাহত।

৮

কলিকাতা

কলিকাতা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর। শুধু ভারতবর্ষের নয় এশিয়া মহাদেশে টোকিও নগরীর পরই কলিকাতার স্থান। ভৌগোলিক হিসাবে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও এর লোক সংখ্যার কথা ভেবে কলিকাতাকে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেওয়া হয় আনুমানিক ১৮৩৪ সালে। কলিকাতা শহরের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। এই শহরটিকে ইংরাজ বণিকেরাই সৃষ্টি করেছে। ১৫৮৬ সালে দিল্লীর বাদশাহ আকবরের রাজস্ববিভাগের কর্মচারী আবুল-ফজলের রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে কলিকাতা নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই এর মনসামঙ্গল পুঁথিতেও চাঁদ সওদাগরের সমুদ্রযাত্রা পথে ভাগীরথী তীরবর্তী কলিকাতার নাম পাওয়া যায়। তখন গ্রামটি ছিল সুন্দরবন এলাকার মধ্যে। শোনা যায় ইংরাজ গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেব আধুনিক পার্কষ্ট্রীটের কাছে হরিণ শিকার করতেন। অবশ্য তখন ওখানে বেশ ঘন জঙ্গল। গড়ের মাঠের জঙ্গলে মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও শোনা যেত।

এখন ইংরাজ বণিক কি করে কলিকাতায় বসতি স্থাপন করলো সেই কথাই বলি। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮

সালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে উপস্থিত হন। তারপর শুরু হয় ভারতবর্ষের বন্দরে পর্তুগীজ বণিকদের আনাগোনা। ভারতবর্ষ যে একটা ঐশ্বর্যশালী দেশ, এদেশের পথের ধূলোয় সোনা ছড়ানো এ খবরটা পর্তুগীজ বণিকরাই ইউরোপের বণিকমহলে প্রচার করে। ডাচ, ফরাসী, দিনেমার— লুব্ধ বণিকের দল ভারতবর্ষের দিকে ধাওয়া করে। ইতিমধ্যে পর্তুগীজেরা ভারতবর্ষের সেরা রাজ্য বাংলা দেশের হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি বানিয়ে জোর ব্যবসা চালাচ্ছে আর সুবিধে মতো হুগলী, মাতলা, বিদ্যাধরী নদীতে জল পথে দস্যু-বৃত্তি করছে। নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে গ্রামবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানোয় "বোম্বেটে" বলে তাদের বদ্‌নামও হয়েছে। কথাটা সম্রাট শাহজাহানের কানে ওঠে। তাঁর আদেশে হুগলীর ফৌজদার হুগলী থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করেন। সেই সুযোগটা নেয় বাংলাদেশে নবাগত ইংরাজবণিক কোম্পানী। হুগলীতে তারা ১৬৫১ সালে প্রথম বাণিজ্যকুঠি তৈরী করে।

কিন্তু এ সুখ বেশীদিন ইংরাজ কোম্পানীর কপালে সইল না। আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার সুবেদার। মহারাষ্ট্রকেশরী মহারাজা শিবাজীর কাছে বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হয়ে ভাগ্যেকে ধরে করে বাংলার সুবাদার হয়ে রাজধানী ঢাকায় বসে একটু আয়েস করছিলেন, এমনি সময় শুনলেন হুগলীর লালমুখো ইংরেজগুলো বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। রেগে আগুন হয়ে হুগলীর মোগল ফৌজদার আবদুল গণিকে হুকুম পাঠালেন, ওদের খতম্ কর। হুকুম পেয়ে আবদুল গণি ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি দিলেন জ্বালিয়ে; এটা ঘটলো ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। জব চার্ণক বলে এক ইংরেজ তখন হুগলীর বাণিজ্য কুঠির প্রধান কর্মচারী। তিনি তখন তাঁর লোকজন নিয়ে জাহাজে চেপে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে পালিয়ে গিয়ে হুগলী নদীর

পূর্ব তীরে সুতানুটি বলে একটা গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে খিদিরপুরের কাছে-গার্ডেনরীচের দুর্গটা অধিকার করেন। বেশীদিন কিন্তু দুর্গ দখলে রাখতে পারেন নি। সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি সামাদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু আবার সুতানুটিতে হাজির হন ১৬৮৭ সালে। বছর খানেক সেখানে বাস করেন। কিন্তু মোগল সৈন্যের আক্রমণে আবার সুতানুটি ত্যাগ করেন। কিন্তু জেদী জব চার্ণক ১৬৯০ সালে ২৪শে আগষ্ট পুনরায় সুতানুটিতে ফিরে আসেন এবং এখানেই ধীরে ধীরে ইংরাজের বাণিজ্য কুঠি গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে সুতানুটির পাশের গ্রাম কলিকাতা আর গোবিন্দপুর নিয়ে শহর কলকাতার পত্তন হয়।

জব চার্ণক যখন সুতানুটিতে ঘাঁটি তৈরী করলেন তখন নীচু জলা-জমিতে ক'ঘর জেলে মালোদের গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর ছিল। ইংরেজ কোম্পানীর মালপত্রের গুদামঘরগুলোও ছিল গোলপাতায় ছাওয়া কাঁচাঘরে।

জব চার্ণক এখনকার বৈঠকখানা বাজারের কাছে একটা বটতলায় আলবোলায় বসে তামাক টানতে টানতে, ব্যবসার কাগজপত্র দেখতেন। তিনি এদেশী মানুষদের সঙ্গে মিশে, চাল-চলনে আদব কায়দায় একেবারে দেশী মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। শোনা যায় এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে তিনি বিবাহ করেন। সেই বিধবাটিকে তাঁর স্বামীর আত্মীয়েরা তাঁর মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়িয়ে মারছিল। তখন এই কুপ্রথাকে 'সতীদাহ' বলা হ'ত। জব চার্ণক ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে তার দুর্বৃত্ত আত্মীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করেন। ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে সমাজপতিরা ত্যাগ করলে জব চার্ণক সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন।

কলিকাতা অঞ্চলের জলবায়ু ছিল খারাপ। নানা রকম রোগে তখন অকালে বিদেশাগত বণিকেরা মারা পড়তো। জব চার্ণকও

১৬৯৩ সালে অকালে মারা যান। এই সময়েই প্রায় শুরু হ'ল, মেদিনীপুরের শোভা সিং-এর বিদ্রোহ। ইংরাজরা ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন বাণিজ্যকুঠিগুলো রক্ষা করার জন্য পাকাঘর বানাবার। সুবাদার পাকাঘর করার অনুমতি দিলেন। চতুর ইংরাজ বণিকেরা সেই সুযোগে একটা দুর্গ তৈরী করে ফেললেন ১৬৯৬ সালে।

তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে ছিলেন রাজা উইলিয়াম। তাঁর নামে দুর্গের নামকরণ হল ফোর্ট উইলিয়াম। কলকাতার লালদীঘি অঞ্চলে তখন ছিল একখানি মাত্র পাকাঘর—এটি বড়িশা সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীবাড়ী। চৌধুরীদের রাধাশ্যামের মন্দির ছিল এ অঞ্চলে। দোলের সময় মন্দির-সংলগ্ন দীঘির জল আবীর আর ফাগে লাল হয়ে যেত বলে এই দীঘির নাম হয় লালদীঘি।

এই সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে কলিকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেন ইংরেজ কোম্পানী ১৬৯৮ সালে। অবশ্য এর জন্য দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমউশ্বানকে ষোলটি হাজার টাকা সেলামী দিয়ে তবে ইংরাজ বণিকেরা জমিদারী কেনার অনুমতি পেয়েছিলেন। এর পর ধীরে ধীরে আশেপাশের আরো পঞ্চান্নখানি গ্রাম নিয়ে বৃহৎ কলিকাতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই গ্রাম ক্রয়ের জন্য তাঁরা দিল্লীর বাদশাহ ফকরুশীয়দের অনুমতি আদায় করেছিলেন মোটা অঙ্কের সেলামীর বিনিময়ে। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা সূত্রে ধীরে ধীরে কলিকাতা অঞ্চলে প্রথম যাঁরা আসেন তাদের মধ্যে শেঠ, বসাক ও মল্লিক পরিবারের নাম করতে হয়। তাঁরাই আদি কলকাতার বনেদী অধিবাসী। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলী বন্দর তখনও সমৃদ্ধির শিখরে। সে অঞ্চল থেকে উচ্চবর্ণের মানুষেরা কলকাতায় আসতে শুরু করেন।

কেমন করে শহরটির কলিকাতা নামকরণ হ'ল এ নিয়ে বেশ

একটা মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। এক সাহেব সবে নতুন বিলাত থেকে এসেছেন। একদিন এক হিন্দুস্থানী ঘাসুড়েকে ঘাস কাটতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করেন জায়গাটার নাম কি? ঘাসুড়ে লালমুখো সাহেব দেখে ভয় পেয়ে ভাবলো—সাহেব হয়তো কবে ঘাস কাটা হয়েছে তাই জানতে চাইছেন। সে বললে "হুজুর কল্ কাটা।" অর্থাৎ সাহেব—কাল কেটেছি। সাহেব ভাবলেন জায়গাটার নাম কলকাটা। সেই থেকে জায়গাটার নাম হল ক্যালকাটা। বাঙ্গালীরা বলতে লাগলেন কলিকাতা।

কেউ কেউ বলেন, কলিকাতা নামের উৎপত্তি ও-ভাবে হয় নি। কালীঘাট থেকেই কলিকাতা নামের সৃষ্টি। মা কালীর পাকা কোঠা বা মন্দির রয়েছে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে আদিগঙ্গার তীরে। তাই কালীরকোঠা থেকে কলিকাতা হয়েছে। কিন্তু কালীঘাট গ্রাম কলিকাতা গ্রামের পাশাপাশি অনেক দিন আগে থেকেই রয়েছে। অনেকে বলেন প্রতাপাদিত্যের খুড়ো বসন্ত রায় সুন্দরবনের অরণ্যের মধ্যে কালী মূর্তি আবিষ্কার করেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করে মা কালীকে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এ অঞ্চল কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে সতীর একটি কড়ে আঙ্গুল পড়েছিল। তাই কালীঘাট এক প্রসিদ্ধ পীঠস্থান বলে সারা ভারতে স্বীকৃত। যাই হোক কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন মনে হয় সেটাই ঠিক। তিনি বলেন কলিকাতা অঞ্চলে যখন শহর গড়ে ওঠেনি তখন এখানে কলি বা চুণের জন্য শামুকের আড়ত ছিল। শামুক পোড়াকে কাতা বলা হয়। চুণারীরা শামুক পুড়িয়ে কলিচূণ তৈরী করতো। প্রাচীন কলিকাতার চুণাপুকুর লেন, চুণাগলি, চুণারীপাড়ার অস্তিত্ব আজও আছে। সুতানুটি গ্রামে যেমন সুতার নুটির কারবার চলতো—তেমনি কলিকাতা অঞ্চলেও ছিল কলিচূণের আড়ত। এখন আর চুণারীপাড়ায়

চুণারীদের দেখা মিলবে না। শহর জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিদায় নিয়েছে।

কলিকাতা অঞ্চলে উচ্চবর্ণের মানুষদের আসবার আগে হাড়ি, ডোম, জেলে, মালো, কসাই, চুণারী ইত্যাদি বর্ণের মানুষদের বাস ছিল। এই বর্ণের মানুষদের বসবাসের জায়গাগুলো আজও কিছু কিছু স্বনামে টিকে আছে। কলিকাতার মত শহরে জেলেপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমতলা, চুণারীপাড়া আজও রয়েছে।

হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণেরা প্রায়ই দেখা যায় ধর্মঠাকুরের উপাসক। মধ্য কলিকাতা অঞ্চলে যে ধর্মঠাকুরের "থান" ছিল তার প্রমাণ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। ধর্মঠাকুরের স্থানকে ধর্মতলা বলে। বোধ করি এখানে কোথাও ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সারা কলকাতাতেই ধর্মঠাকুরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল এবং তার গাজনও হ'ত।

নাথযোগী ও পণ্ডিতদের প্রতিপত্তিও প্রাচীন কলকাতায় ছিল খুব। এখনও উত্তর কলকাতায় যোগীপাড়া আছে। দক্ষিণ কলিকাতাতেও যোগীপাড়ার অস্তিত্ব ছিল। এই নাথযোগীদের উপাস্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন গোরক্ষনাথ আর মীননাথ। দমদমে গোরক্ষনাথের মঠ আছে। চৌরঙ্গীনাথও নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুরু। তাঁরই কোন মঠ বা মন্দির নিশ্চয় ছিল ধর্মতলার কাছাকাছি অঞ্চলে। সেই নাথগুরু চৌরঙ্গীনাথের নাম থেকেই ইংরেজ সৃষ্ট কলিকাতার শ্রেষ্ঠ অঞ্চলের নাম হয়েছিল চৌরঙ্গী।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে হুগলী অঞ্চল থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ এসে কলকাতায় নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন সে অনেক পরে। তারও অনেক আগে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর নগরের পতনের পর সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই উচ্চবর্ণের মানুষেরা বাংলা দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিলেন।

এমনি একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ জগন্নাথ কুশারী যশোহর থেকে

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে ভাগীরথী তীরে ইংরাজ বণিকদের গ্রাম গোবিন্দপুরে হাজির হন। তখন এ অঞ্চলে জেলে, মালো ইত্যাদি মানুষদের বাস। তারা একঘর 'বামুন' পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল। জগন্নাথকে তারা "ঠাকুরমশাই" বলে ডাকতে থাকে। সেই থেকে জগন্নাথ কুশারী হয়ে গেলেন জগন্নাথ ঠাকুর। এদিকে জগন্নাথ নতুন কলিকাতা বন্দরের ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে আলাপ জমান। তাদের মাল পত্র কেনা বেচার কাজে সাহায্য করে অর্থোপার্জন করেন। ক্রমশঃ সেই জাহাজের সাহেবদের মুখে মুখে জগন্নাথের নতুন ঠাকুর উপাধিটা বদল হয়ে হল 'টেগোর'।

এই বংশের নীলমণি ঠাকুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করে বেশ ভাল রকম অর্থই উপার্জন করেন, তারপর একদিন নীলমণি ঠাকুর গঙ্গার ধারে পাথুরিয়া ঘাটায় বেশ বড় বাড়ী তৈরী করে বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু বেশীদিন সুখভোগ করা হ ল না ভাই দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বাধলো বিরোধ। নীলমণি ঠাকুর, বাড়ী আর জমিজমা ভাইকে দিয়ে নগদ একলক্ষ টাকা নিয়ে, কলিকাতার চিৎপুরের রাস্তার ধারে জমি কিনে বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করলেন ১৭৮৪ সালে। এই অঞ্চলে নাকি দেবী চিত্রেশ্বরীর মন্দির ছিল তাই এ অঞ্চলের নাম চিত্রপুর বা চিৎপুর। অবশ্য নীলমণি ঠাকুর যেখানে বাড়ী করলেন সে পাড়ার নাম ছিল মেছোবাজার। জোড়াসাঁকো নাম হয় জায়গাটির অনেক কাল পরে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ির বিদ্যোৎসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সঙ্গীতবিদ্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বাংলা দেশের মানুষের কাছে সুপরিচিত। এঁদেরই বেলগাছিয়ায় নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী অভিনয় দেখে মাইকেল নাটক লেখার প্রেরণা পান।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। সে তো অনেক পরের কথা। তারও আগে কলিকাতার

ইংরাজ কোম্পানী চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে মুর্শিদাবাদের তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্য। ক্ষিপ্ত নবাব ছুটে এসেছেন কলকাতায়। ইংরাজ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে রেখেছেন সাতমাস। পরে সন্ধি করে সিরাজ ফিরে যান মুর্শিদাবাদে। কলিকাতার নাম বদল করে নতুন নাম দেন আলীনগর। উত্তর কলিকাতার যে অঞ্চলে নবাব সিরাজদ্দৌলার হাতী রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল সে জায়গাটার নাম এখন হাতী বাগান।

১৭৫৭ সালে সিরাজের পরাজয় ঘটে আর ১৭৭৪ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে কোষাগার কলিকাতায় নিয়ে আসেন হেষ্টিংস। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল, সোজা কথায় বড়লাট। ইতিমধ্যে পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম ভেঙে নতুন কেল্লা তৈরী হয়েছিল আরো দক্ষিণে গোবিন্দপুর অঞ্চলে।

নবাব আলীবর্দ্দীর আমলে কলিকাতার ইংরেজরা বড় ভয়ে ভয়ে থাকতো, কখন মারাঠা বর্গীরা এসে তাদের এমন সাধের শহরে হানা দেয়। একবার তো সারা শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল—মারাঠা বর্গী আসছে। শহর থেকে কালা আদমীদের বার করে দিয়ে হুগলী নদীর পূব দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা মস্ত খাল কাটা সুরু করে দেয় সাহেবরা। খালকাটা পুরো হল না। শোনা গেল বর্গীরা ফিরে গেছে। খাল সেই অবস্থায় পড়ে রইলো। খালের নাম হ'ল 'মারহাট্টা ডিচ্' বর্ষাকালে তাতে জল জমতো সেই জলে সারা শহরের আবর্জনা পড়তে লাগলো বছরের পর বছর। খালের দুর্গন্ধে শহরে টেঁকা দায় হ'ল। শেষে ১৭৮০ সাল নাগাদ হেষ্টিং-এর হুকুমে খাল ভরাট হল। ফলে বেশ চমৎকার একটা রাস্তা বেরিয়ে পড়লো নাম হ'ল সার্কুলার রোড। এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড আর আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোডে তার রূপান্তর ঘটেছে। হেষ্টিংস সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে কলিকাতায়

আলীপুরে এনে বসবাস করান। পরে তাঁর সম্পত্তি ও বাড়ী কোম্পানীর নামে নিজেই দখল করেন। গভর্ণর জেনারেল রূপে তিনি তাতে কিছুদিন বাসও করেগেছেন। আলীপুর কোর্টের পাশে হেষ্টিংস হাউসে মহিলাদের ট্রেনিং কলেজ হয়েছে। পরে ১৮০৩ সালে গভর্ণর জেনারেলের বর্তমান বাড়ী তৈরী হয় গড়ের মাঠের ধারে। ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯১১ পর্যন্ত বাংলার লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণররা বেলভেডিয়ারের একটি বিরাট প্রাসাদে বাস করেছেন। কলিকাতা থেকে ১৯১১ সালে দিল্লীতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হলে বাংলার ছোটলাট বড়লাটের বাড়ীতে চলে আসেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ইংরাজ আমলের বড়লাটের গৃহেই অধিষ্ঠিত। বেলভেডিয়ারের সেই বাড়ীতে এখন সুবিখ্যাত ন্যাশানাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত। এই 'জাতীয় গ্রন্থাগারের' পুর্ব নাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। ১৮৩৫ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পুস্তকাগারের ৪৫০০ পুস্তক নিয়ে মেটকাফ হলে এর সূচনা হয়। এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কর্মচারী ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ইনি টেঁকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে 'আলালের ঘরে দুলাল' বলে গ্রন্থ লিখে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হন বিশিষ্ট ভাষাবিদ হরিনাথ দে। ইনি মাত্র ৩৪ বছর জীবিত ছিলেন। ৩৩টি ভাষায় এঁর দখল ছিল শোনা যায় ১৪টি ভাষায় ইনি এম, এ ছিলেন।

১৭৮৪ সালে—যে বছর জোড়াসাঁকোয় নীলমণি ঠাকুর 'ঠাকুর বাড়ীর' পত্তন করেন, ঠিক সেই বছরই সুবিখ্যাত ভারত-প্রেমিক পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্স কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ঠাকুরবাড়ী আর এশিয়াটিক সোসাইটি উভয়েরই অবদান অমূল্য। প্রাচ্যে বিস্তার অনুশীলন ও গবেষণার জন্য এই সোসাইটির সৃষ্টি। সারা পৃথিবীতে এই জাতীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বেশী নেই। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ চার্লস উইল কিন্স, টমাস কোলব্রুক, ব্রাসী হ্যালহেড প্রমুখ মনীষিবর্গ

সোসাইটির সভ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সোসাইটির উন্নতির জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। ফলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ইতিহাসের স্বর্ণযুগের শুরু। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন সুপণ্ডিত উইলিয়ম কেরী। তাঁর সঙ্গে আসে তাঁর মুন্সী রামরাম বসু। ১৮০১ সালে রামরাম কেরীর অনুপ্রেরণায় প্রতাপাদিত্য চরিত বলে একটা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্য পুস্তক। এর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বাংলাদেশের পক্ষে সেদিন খুব একটা শুভদিন যেদিন রামমোহন রায় কলকাতার মাণিকতলায় বাস করতে এলেন। তাঁর ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় বলতে গেলে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ডেভিড হেয়ার এক আশ্চর্য মানুষ। সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা করতে। ব্যবসায় লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু সে টাকা এদেশবাসীর জন্য ব্যয় করে গেছেন। সেদিন কলকাতার পথে মাথায় মস্ত টাক ওয়ালা মধ্যমাকৃতি এক সাহেবের চেহারার সঙ্গে কলকাতার দুঃস্থ ছাত্রদের বিশেষ পরিচয় ছিল। হেয়ার সাহেবের নিজের স্কুল ছিল। একটু ধরাধরি করলেই সেই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পাওয়া যেত। কলকাতার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছেন। হেয়ার সাহেব যখন পাল্কী করে যেতেন তখন তাঁর পাল্কীর সঙ্গে গরীব ছেলেরা 'মি পুওর বয়, মি পুয়োর বয়' বলে ছুটতো। হেয়ার তাদের আদর করে মুখ মুছিয়ে দিতেন—মিষ্টি খাওয়াতেন। আজও হেয়ার স্কুল তাঁর স্মৃতি ধারণ করে আছে।

কলকাতার সে আমলের আর একজন বিখ্যাত মানুষ ডিরোজিও। এঁর দেহে ছিল পর্তুগীজ রক্ত। মায়ের দিক থেকে

তিনি এদেশী। এণ্টালী অঞ্চলে ছিল এঁর বাড়ী। মাত্র ২২ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবান এই তরুণ অধ্যাপকটির ছাত্রেরা সে আমলের রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থা, রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রাম করেছেন। এঁর প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা মেপে খ্যাতি লাভ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল' রচনা করে যশের অধিকারী হন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এঁর পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। রামগোপাল ঘোষ ছিলেন প্রখ্যাত বাগ্মী, এঁকে ভারতের ডিমিসথিনিস্ বলা হ'ত। ইনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও বিধবা বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করেন। ডিরোজিও, হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরবর্তী কালে এই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, এঁদেরই সমকালেই বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখন একই বাড়ীতে বসতো হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ। ডাঃ উইলসন প্রমুখ ভারত-প্রেমিকদের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়।

সেদিন বড়বাজারের দয়েহাটা থেকে একটি খর্বাকৃতি মস্ত মাথাওয়ালা তরুণ ছাত্র গোলদীঘি অঞ্চলে সংস্কৃত কলেজে পড়তে আসতেন। নিজ হাতে রান্না করে, বাবার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে, ভাইদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে তবে কলেজে আসতেন। রাত্রে তেলের পয়সা জুটতো না বলে রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়তেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী কালে সংস্কৃত কলেজের দেওয়া উপাধি বিদ্যাসাগর নামে সারা ভারতে সুবিখ্যাত হন। রামমোহন যেদিন ১৮২৯ সালে সতীদাহ বন্ধ আইন পাশ করান সেদিন বিদ্যাসাগর কলিকাতায় সদ্য সমাগত। নবযুগের নতুন মানুষ রামমোহন কেমন করে অনেক দিনের অনেক মিথ্যা আর অন্যায়ে

ভরা সামাজিক কদাচারকে আঘাত করলেন সেদিন তা বোঝবার মত বয়স তাঁর হয়তো হয়নি। কিন্তু যুগ যে পাল্টাচ্ছে এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের তরুণ শিক্ষার্থীরা যেদিন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের নিষেধ অগ্রাহ্য করে শব ব্যবচ্ছেদ করলেন, সেদিন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে যে তোপধ্বনি করা হয়েছিল, তা তিনি শুনেছিলেন। তাই অকুতোভয়ে আর্ত অসহায় নাবালিকা বিধবাদের বাঁচাতে রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ আইন যাতে পাশ হয় তার জন্য লাট সাহেবের কাছে তিনি আবেদন পত্র পেশ করেছিলেন। সে আবেদন পত্রে সারা কলকাতার সুশিক্ষিত মানুষেরা স্বাক্ষর দিয়ে ছিলেন। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা বিদ্যাসাগরের আবেদনের বিরুদ্ধে রাজসরকারের কাছে আবেদন করেন। বিদ্যাসাগরের প্রাণহানি ঘটাবার জন্যও চেষ্টা হয়েছিল। তবে তাঁর রক্ষক শ্রীমন্তের লাঠির ঘায়ে দুর্বৃত্তরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সেদিন বাড়ীর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে কেউ চাইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন জেলায় কতকগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলকাতার প্রসিদ্ধ বেথুন কলেজটি তাঁরই প্রচেষ্টায় আজ এত খ্যাতির অধিকারী। সুবিখ্যাত বেথুন সাহেব স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হঠাৎ বেথুনের মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যালয়টির দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের ওপর পড়ে। তাঁরই যত্নে ও শ্রমে বিদ্যালয়টির উন্নতি ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা সৌদামিনী দেবীকে বেথুন স্কুলে পাঠান। এই সময় বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটে। সৌদামিনী একদিন পাল্কী করে স্কুলে আসছেন। পাল্কীর দরজার বাইরে তাঁর সুগৌর হাতটা মাত্র দেখা যাচ্ছে। পথ-চলতি এক ইংরেজ সৈন্যের সন্দেহ হ'ল এ নিশ্চয় মেম-সাহেব, সিপাহী সৈন্যরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যটি পাল্কী আটক করে তল্লাসী করে। তখন উত্তর পশ্চিম ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। সারা শহরময় দারুণ হৈ চৈ

পড়ে গেল—শেষে জানা গেল আসল ব্যাপারটা। কলকাতাতে হৈ চৈ আর হুজুগের অন্ত নেই—হুতুম পেঁচার নক্‌সায় কালীসিংহ তা একশ বছর আগেই বলে গেছেন। হিন্দু কলেজের উনিশ বছরের ছাত্র মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হবে—সারা কলকাতায় কি উত্তেজনা। মধুসূদনের বাবা হাইকোর্টের বাঘা উকিল জমিদারী থেকে লাঠিয়াল আনালেন, পাদরীদের কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে আনবেন। পাদরীরা তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে লুকিয়ে রেখে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিলেন।

কলকাতার বুকে উত্তেজনার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ সালের এক সন্ধ্যায়। এইদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশ বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহ করতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আসেন। সঙ্গে বরযাত্রী ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই, রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, পাইকপাড়ার জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরের বছরই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর যদুনাথ বসু বলে দু'জন যুবক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বি, এ, পাশ করেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের উপযাজক হয়ে ডেপুট ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী দেন। সেই সরকারী চাকুরী-প্রীতির যুগে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল প্রমুখ একদল যুবক প্রতিজ্ঞা করলেন সরকারী চাকুরী কোনদিন করবেন না। স্বাধীনতার জন্য দেশের চিন্তাশীল মানুষদের মনে একটা আগ্রহ ধীরে ধীরে জাগছিল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাজনারায়ণ বসুর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে নবগোপাল মিত্র বলে একজন শিক্ষক হিন্দুমেলার সূচনা করেন। হিন্দুমেলায় জাতীয় ভাবের প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়। এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় কলকাতার পার্ক-সার্কাস অঞ্চলে। ১৮৭৫ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির ঘোষ রাজনৈতিক আন্দোলন করার জন্য ইণ্ডিয়ান লীগ

স্থাপন করেন। পর বৎসর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাকা দুর্গামোহন দাশ ঐ একই উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' স্থাপন করেন। এই ভারত সভার সভাপতি হবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলেন। দেশের মানুষের কৃতঘ্নতায় বিদ্যাসাগর এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে কোন ব্যাপারে আর মাথা গলাতে রাজী ছিলেন না। যাই হোক, এই ভারত-সভা পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়। বৌবাজার ষ্ট্রীটে এখনও ভারত সভা ভবনটি রয়েছে।

কলকাতায় উত্তেজনা আর আনন্দের বন্যা বয়ে যায় যেদিন খবর আসে সুদূর আমেরিকায় শিকাগো নগরে এক নিঃসম্বল তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী বেদান্তের বাণী দিয়ে পাশ্চাত্যের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। সেই নিঃসম্বল সন্ন্যাসী কলকাতার সিমলা অঞ্চলের নরেন্দ্র দত্ত। ইনি সারা জগতে বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত। ক'বছর পরে বিবেকানন্দ জাহাজে করে দেশে ফিরলেন। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছলে, রিপণ কলেজের ছাত্ররা তাঁকে একটা ফিটন গাড়ীতে তুলে, গাড়ীর ঘোড়া খুলে সেই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়। এমন দিন কলকাতার জীবনে খুব বেশী আসেনি। সেই ঘটনার পর থেকেই ভারতবর্ষে ছাত্র জাগরণের সূত্রপাত। ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসক লর্ড কার্জন বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার কথা বুঝতে পেরে বাংলাদেশকে দু' টুকরো করেন। বাঙালী জাতি সেদিন ক্রোধে গর্জে উঠেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন পথে নেমে আপন হাতে রাখী পরিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান সকলের হাতে।

বাঙালী ছেলের দল বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য জীবন পণ করেছিলেন। সুদূর বরোদা থেকে রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় এসে বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। কলকাতার মাণিকতলায় বোমার কারখানা খোলা হয়। আলীপুরের

অত্যাচারী জজ সাহেব কিংস ফোর্ডকে মারতে গিয়ে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসী হয়ে যায়। ক্ষুদিরামের হাতে যে বোমা ফাটে তা মাণিকতলায় তৈরী। মাণিকতলা বোমার মামলার কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগ্নেয় অক্ষরে লেখা আছে। এই বোমার মামলায় শাস্তি পেয়ে বাঙালী তরুণেরা আন্দামান দ্বীপে প্রেরিত হন। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের বন্দী করে রাখা হ'ত বৃটিশ আমলে। তারপর বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানীর সহযোগিতায়, যে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়—তখন বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় সি, মার্টিন ছদ্মনামে খিদিরপুর থেকে জাহাজে করে যবদ্বীপের বাটাভিয়া বন্দরে পালিয়ে যান।

মহাত্মা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়—কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস—তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবসা ছেড়ে দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হন। এই ত্যাগী-শ্রেষ্ঠের সমাধি-মন্দির কেওড়াতলা মহাশ্মশানে রয়েছে। এ একটা পবিত্র তীর্থস্থান।

কলকাতার সুসন্তান সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস, চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কারাগারে বার বার বন্দী হয়েও এই বীর বিপ্লবীর অদম্য দেশপ্রেমকে বিনষ্ট করতে পারেনি ইংরাজ শাসকবৃন্দ। কলকাতার বুকে হল হয়েল স্তম্ভ দাঁড়িয়েছিল মিথ্যা অন্ধকূপ হত্যার স্মারক চিহ্ন হয়ে। সুভাষচন্দ্র তা আন্দোলন করে উৎখাত করেন। তারপর একদিন বৃটিশ শাসকের শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শিবাজীর মতই পলাতক হন। দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে মস্কো হয়ে বার্লিন যান। সেখান থেকে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে—সাব-মেরিনে জাপানে উপস্থিত হন। তারপর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে ভারত ভূমির পূর্বপ্রান্তে কোহিমায় এসে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন।

স্বাধীনতা পাবার পর কলকাতার চেহারা পাল্টেছে। বৃটিশ শাসকদের মূর্তিগুলোর অপসারণ শুরু হয়েছে। জেনারেল আউট-রামের ঘোড়ায় চড়া তলোয়ার হাতে মূর্তির স্থলে, গান্ধীজীর-লবণ আইন ভঙ্গের সময়ের ডাণ্ডি মার্চের অবিস্মরণীর ভঙ্গিটি শিল্পী দেবীপ্রসাদ ব্রোঞ্জে ঢালাই করে কলকাতার বুকে স্থাপন করে গেছেন। ঠাকুরবাড়ীর আর এক সুসন্তান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন করেছেন আপন প্রতিভায়। কলকাতা আর্ট কলেজের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ।

এঁর ছাত্ররা আজ সারা ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করছেন। দেবীপ্রসাদ এঁরই ছাত্র। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দুটি মূর্তির মধ্যে একটি স্থাপিত হয়েছে গড়ের মাঠের ধারে। আর একটি শ্যাম-বাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে। রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি বসবে আজ যেখানে রাজা পঞ্চম জর্জের মূর্তি আছে সেখানে। নকল রাজার জায়গায় আসল রাজা আসন নেবেন কলকাতার বুকে। রাস্তার নামও পাল্টাচ্ছে—বৌবাজার ষ্ট্রীটের নাম বদলে হয়েছে বিপিন গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট। বিপিন গাঙ্গুলি ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী। এঁর জীবনের অনেক উপাদান নিয়ে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর পথের দাবী উপন্যাসের সব্যসাচীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নামেও রাস্তা হয়েছে। এঁর জীবনের প্রভাবও পড়েছে শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী চরিত্র-সৃষ্টিতে। হ্যারিসন রোড আজ মহাত্মা গান্ধী রোডে রূপান্তরিত। এ ছাড়া আরো অনেক রাস্তা আর পার্কের নাম পাল্টে ত্যাগী, দেশকর্মী অথবা মনীষদের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কটি প্রখ্যাত দেশ-সেবক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নামের সঙ্গে জড়িত। দেশের মানুষ শ্রদ্ধাভরে যতীন্দ্রমোহনকে উপাধি দিয়েছিলেন দেশপ্রিয়। উত্তর কলিকাতার একটি বৃহৎ পার্কের নাম রাখা হয়েছে দেশবন্ধু পার্ক। দানবীর ও দেশসেবক চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়েছিল। দেশবন্ধু তাঁর বসতবাটিও দেশকে দান করে গেছেন। সেখানে

আজ চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতাল। এটা আজ ক্যানসার রোগের গবেষণাগার

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরো পাঁচটি প্রদেশের বাণিজ্য পণ্য আমদানী রপ্তানী হয়। কলিকাতার পৌর শাসন কার্য পরিচালনার জন্য ১৮৪৭ সালে একটি মিউনিসি-প্যালিটি তৈরী হয়েছিল। ১৯২৪ সালে স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলকাতা কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার প্রথম মেয়র। কলকাতা নগরের মত কলকাতা বন্দর পরিচালনার জন্যও ১৮৭০ সালে পোর্ট কমিশনারের অফিসের সৃষ্টি হয়।

গত শতকের শেষের দিকে কলকাতায় প্রথমে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতো। পরে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রাম চলতে সুরু করে। উত্তর কলকাতার পলতায় জলের ট্যাঙ্ক বসে। পরিশুদ্ধ জল মাটির তলার মোটা পাইপ দিয়ে—নাগরিকদের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে সুরু করে। আগে গঙ্গা থেকে জল ধরে রাখা হ'ত বড় বড় জালায় করে—একথা রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে জানা যায়।

দেশের মানুষ যখন জাগে তখন সে তার দেশের অতীত ঐতিহ্যের কথা জানতে চায়। একটা জাতির কথা লেখা থাকে তার শিল্পে সাহিত্যে। বিবেকানন্দ যে বছর চিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতবর্ষের জয়পতাকা উড়িয়ে এলেন, তার পরের বছর বাংলা সাহিত্যের চর্চা আর গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কবি নবীন সেন, কবি রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে এগিয়ে এলেন সাহিত্য পরিষদের কাছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীবর্গ পরিষদের পক্ষ থেকে প্রাচীন বাংলা পুঁথি আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের কাজে আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এক অমূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন। সেটি চর্যাপদ—প্রাচীন বাংলা ভাষায় লেখা একটি পুঁথি। পুঁথিটি প্রায় হাজার বছরের। এর চেয়ে প্রাচীন বাংলা পুঁথি আর পাওয়া যায় নি।

প্রাচীন পুঁথি আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের কথায় মনে পড়ে যায় কলকাতা যাদুঘরের কথা। মিউজিয়ামের বাংলা প্রতিশব্দ হয়েছে যাদুঘর। কলকাতার যাদুঘরের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। ডাক্তার ওয়ালিচ বলে এক দিনেমার উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ প্রখ্যাত বাগ্মী কেশব সেনের ঠাকুর্দা রামকমল সেনের সহায়তায় কলকাতা যাদুঘরের সূচনা হয়। মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সমূহ এখানে রাখা হয়েছে। সারনাথের অশোক স্তম্ভের চূড়াটি এখানে সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া আরো অনেক বস্তু রয়েছে যার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। দেশ বিদেশের অনেক প্রখ্যাত কমিটি, অধ্যাপক, ছাত্র এখানে এসে গবেষণা করে থাকেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের প্রায় এক কোটি মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন, তাঁদের প্রায় অধিকাংশ কলকাতা ও তার পাশে বসতি স্থাপন করেন। ফলে কলকাতা শহর হুগলী নদীর পুর্বতীরে উত্তর কামারহাটি থেকে দক্ষিণে টালীর নালার কাছে গড়িয়া পর্যন্ত আজ বিস্তৃত। ভাগীরথীর স্রোত মন্দীভূত হচ্ছে, তাই ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে কলকাতাকে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। একদিন বড় বড় জাহাজ অক্লেশে হুগলী পর্যন্ত চলে যেত, আজ গঙ্গায় চড়া পড়ার জন্য তা আর সম্ভব হচ্ছে না। হিন্দু-বৌদ্ধযুগে মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। তারপর সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম হল বাংলার সেরা বন্দর। সরস্বতী মজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী তীরে হুগলী বন্দর পর্তুগীজ বণিকদের চেষ্টায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। হুগলী নদীতে পলির আধিক্য হওয়ায় জাহাজ চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায় আরো দক্ষিণে ইংরেজ সৃষ্ট কলকাতা বন্দর হুগলী বন্দরের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়ে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর রূপে স্বীকৃতি পায়। ইতিহাসের রথও এগিয়ে চলেছে। কর্ণসুবর্ণের পর গৌড়-পাণ্ডুয়া থেকে রাজমহল হয়ে ঢাকা, সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতায় এসে থেমেছে তার চাকা। কতদিনের জন্য ইতিহাসই তার জবাব দেবে।

বিগত দুশো বছর ধরে বন্দর নগরী কলকাতা এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের প্রভাব পড়েছে সারা ভারতবর্ষে। রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নেতা বলে মেনেছে আসমুদ্র হিমাচল। বৈপ্লবিক চেতনার জন্মস্থান তো কলকাতাই। বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতার প্রেরণায় অরবিন্দ ঘোষ, প্রমথ মিত্রের হাতে গড়া ছেলেরা হাসিমুখে ফাঁসী বরণ করেছেন। সাহিত্যে কলকাতার সন্তান রবীন্দ্রনাথ আর মাইকেল মধুসূদন শুধু বাংলা সাহিত্যের নয় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরও নব-ভগীরথ বলে স্বীকৃত। এঁদের সকলের কর্ম-সাধনার ক্ষেত্র ছিল শহর কলকাতা। কলকাতা থেকে যে তরঙ্গ উঠতো তা বাংলাদেশ ছাড়িয়ে, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তো। মহামতি গোখলে একদিন বলেছিলেন, আজ বাংলাদেশ যা ভাবছে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তা ভাববে (What Bengal thinks to-day India will think to-morrow) গোখলে কলকাতার চিন্তাশীল বাঙালী সমাজের উদ্দেশ্যেই কথাটি বলেছিলেন। আজ কলকাতার জীবন সহস্র সমস্যায় বিপর্যস্ত হলেও, কলকাতা এখনও সারা ভারতের লক্ষ্যস্থল। আগামীকালেও বহুদিন পর্যন্ত কলকাতা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হয়ে থাকবে।

৯



চব্বিশ পরগণা

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি চব্বিশপরগণা। জেলাটির পাদদেশে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে হুগলী নদী। এ ছাড়া বিদ্যাধরী, ইচ্ছামতী, মাতলা, পিয়ালী প্রভৃতি অসংখ্য নদী জেলাটার বুক দিয়ে বয়ে গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদী-মাতৃক জেলাটার নদীর ভাঁটা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত; তাই মধ্যযুগে একে ভাটির দেশ বা ভাটি বলা হত। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এর নাম ছিল সমতট।

সমতট প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান আমলে এই অঞ্চলটা সাতগাঁ সরকারের অধীন হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর মীরজাফর দক্ষিণ বাংলার ভাটি অঞ্চলের চব্বিশটা পরগণার জমিদারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উপহার দেন। পরে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভকে ব্যক্তিগত জায়গীর হিসাবে ২৪পরগণার জমিদারী দেওয়া হয়। ১৭৭৪ সালে ক্লাইভের মৃত্যুর পর ২৪পরগণা আবার কোম্পানীর হাতে ফিরে আসে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ২৪পরগণা জেলাকে ভেঙ্গে আলিপুর ও বারাসত বলে দুটো জেলা তৈরী করা হয়। পরে আবার দুটো জেলা এক হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘকাল ধরে নানা পরিবর্তনের পর ১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্ট জেলাটা বর্তমান আকার ধারণ করে! দেশ বিভাগের ফলে

যশোহরের বনগ্রাম ২৪পরগণায় আসে। ফলে জেলাটি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা।

জেলাটির পূর্বদিকে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা, উত্তরে নদীয়া আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

জেলাটি আসলে নদীর পলিতে তৈরী সমভূমি। এর উত্তর দিকের অংশটা দক্ষিণ দিকের চেয়ে উঁচু। দক্ষিণে সুন্দরবন ভূ-ভাগটিতে এখনও মাটির ভাঙাগড়া চলেছে। নীচু জলা-জমিতে এখনও মানুষের যথেষ্ট আবাসস্থল গড়ে উঠতে পারে নি। শিল্প তো দূরের কথা। শিল্পাঞ্চল তাই প্রায় সবটাই উত্তর দিকে গঙ্গার তীরে তীরে গড়ে উঠেছে। বজবজ থেকে বীজপুর পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত। দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী এই বিচিত্র অঞ্চলটির উল্লেখ পৌরাণিক কাহিনীতেও আছে। মহাভারতে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে বঙ্গদেশের বিখ্যাত তীর্থ সাগর-সঙ্গমে, সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলমুনির আশ্রম সাগরদ্বীপে এসেছিলেন; সাগরদ্বীপ ২৪পরগণায় অবস্থিত।

কথিত আছে সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করে ইন্দ্র কপিলমুনির আশ্রমে লুকিয়ে রেখেছিলেন। অশ্ব অন্বেষণে এসে সগরের পুত্রেরা কপিলমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং কপিলমুনিকে চোর বলে গালাগালি দিলে মুনির অভিশাপে সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্মে পরিণত হয়। অনেক বছর পরে সগরের পরিত্যক্ত পুত্র অসমঞ্জের বংশজাত ভগীরথ গঙ্গার পূতধারাকে হিমালয় থেকে উত্তর ভারতের পথে বাংলাদেশে আনয়ন করেন। কলকাতার পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ছত্রভোগ নামক স্থানে গঙ্গা শতধারায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়। এখানে গঙ্গাদেবী আপনার জ্যোতির্ময় চক্র ভগীরথকে প্রদর্শন করেন। পরে এখানে গড়ে ওঠে প্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ।

মথুরাপুরের বাস রাস্তার ধারে আদিগঙ্গার মরা খাতে ধান ক্ষেতের মধ্যে একটা জীর্ণ বাঁধান ঘাটে চক্রতীর্থের স্মৃতি মাত্র

অবশিষ্ট আছে। অথচ একদিন শ্রীচৈতন্যদেব আদিগঙ্গার তীরে তীরে নীলাচল যাবার পথে ছত্রভোগের চক্রতীর্থে উপস্থিত হন। এ অঞ্চলের ফৌজদার রামচন্দ্র খাঁ তাঁর নীলাচল যাত্রার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করে দেন। এ তো গেল মধ্যযুগের কথা।

দু' হাজার বছর আগে বিদ্যাধরী নদীর ধারে যে সুপ্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভার্জিলের কাব্যে গঙ্গারিড বা গঙ্গারাঢ় বলে একটা রাজ্যের উল্লেখ আছে। কবি সে রাজ্যের অধিবাসীদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থেও রাজ্যটির নাম পাওয়া যায়। এই রাজ্যের 'গঙ্গে' বন্দরে মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ থেকে দু' হাজার বছর আগে বাণিজ্য-পোত আসতো। অনেকের মতে এই 'গঙ্গে' বন্দর ছিল বসিরহাট মহকুমার বালোন্দ পরগণার বেড়াচাঁপা গ্রামের চন্দ্রকেতু গড়ে। চন্দ্রকেতু গড় খননের ফলে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণযুগের এমন কি পাল-সেন আমলের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। একটা রূপার মুদ্রা পাওয়া গেছে, তাতে পাল তোলা জাহাজের ছবি উৎকীর্ণ। মনে হয় বাঙালী জাতির সমুদ্রযাত্রার এটা ঐতিহাসিক পরিচয়।

চন্দ্রকেতু গড়ের সম্পর্কে চমৎকার একটি কাহিনী আছে। বসিরহাট অঞ্চলের সুবিখ্যাত পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে রাজা চন্দ্রকেতুর বিরোধ হয়। পীর চাইছিলেন রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করুন। আপন শক্তি দেখাবার জন্য পীর রাজবাড়ীর লোহার বেড়ায় টাট্‌কা সুগন্ধি চাঁপা ফুল ফুটিয়ে তোলেন। বোধ করি তাই জায়গাটার নানা বেড়াচাঁপা। রাজা চন্দ্রকেতু এতে অভিভূত না হয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন।

যুদ্ধযাত্রার আগে পরিবারবর্গকে বলে যান যুদ্ধে জিতলে সাদা পায়রা ওড়াবেন আর হারলে ওড়াবেন কালো পায়রা। কূট-কৌশলী পীর এই গোপন খবরটা জানতে পেরে যুদ্ধ শেষ হবার আগেই

কালো পায়রা উড়িয়ে দেন। সেই পায়রা দেখে চন্দ্রকেতুর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গড়ের দহে আত্মবিসর্জন দেন। এদিকে চন্দ্রকেতু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে-স্ত্রী-পুত্র কন্যার শোচনীয় মৃত্যুর কথা জেনে দহের জলে ডুবে মরেন।

বিদ্যাধরী তীরে আর একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে ভরা গ্রাম আটঘরা। গ্রামটা বারুইপুরের কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত। আটঘরার মাটির তলা থেকেও মৌর্য আমলের মূর্তি ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। শুঙ্গযুগের যক্ষিণী মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। পালযুগের কিছু কিছু নিদর্শন মিলেছে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন দু'হাজার বছর আগে আটঘরা ছিল ইন্দো-রোমান বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র। অনেকে আটঘরা আর বারুইপুরের নিকটবর্তী আটিসারাকে একই স্থান বলে মনে করেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আদিগঙ্গার তীরবর্তী বোড়াল গ্রামের বহু প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বোড়াল গ্রামের ভূগর্ভ থেকে মৌর্য-শুঙ্গ যুগ থেকে আরম্ভ করে পাল-সেন আমলের অনেক পুরাকীর্তির নিদর্শন বেরিয়ে এসেছে। সুযোগ্য সেন প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর অষ্টধাতু-মূর্তি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

হুগলী নদীর মোহনার কাছে ডায়মণ্ডহারবারের মাইল কয়েক দক্ষিণে হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত মাতৃকা মূর্তি ও শীলমোহর সিন্ধুনদের তীরে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সুপ্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগে চব্বিশ পরগণা অঞ্চল ছিল প্রবল প্রতাপশালী ভূঁইঞা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রতাপাদিত্যের নৌবহর আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী আর মাতলা নদীতে টহল দিয়ে ফিরতো। কারণ পর্তুগীজ বোম্বেটের দল তখন নদীপথে দক্ষিণ বাংলার গ্রামগুলোতে ঢুকে দারুণ অত্যাচার চালাতো। দলে দলে নারী-পুরুষকে তারা বন্দী করে ক্রীতদাসরূপে বিদেশের বাজারে

বিক্রী করে দিত। এরা ঘাঁটি তৈরী করেছিল সুন্দরবনের মধ্যে বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা গ্রামে। বাঙালী নৌ-যোদ্ধারা এদের শায়েস্তা করে।

প্রতাপাদিত্যের তৈরী গড়, দুর্গ ও জাহাজ তৈরীর ঘাট, চব্বিশ পরগণার নানা স্থানে দেখা যায়। উত্তরে জগদ্দল থেকে বেহালা, সরশুনা আর দক্ষিণে মাতলা, সাগরদ্বীপে আজও সেগুলো ভগ্নজীর্ণ হয়ে জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগলের সংঘর্ষ ঘটে। দিল্লী থেকে বাইশজন আমীর আসেন তাঁকে জব্দ করতে, কিন্তু বাঙালী সেনার কাছে তাঁরা পরাজিত ও নিহত হন। আকবরের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজা মানসিংহ বিরাট মোগল বাহিনী নিয়ে যশোহর আসেন। ধুমঘাটের যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহ নিহত হন এবং আরেক পুত্র জগৎসিংহ [illegible] হন। তা সত্ত্বেও নৌবাহিনী পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা ঘটায় প্রতাপের পরাজয় ঘটে। বীরশ্রেষ্ঠ সূর্যকান্ত গুহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। শঙ্কর পণ্ডিত বারাসতে আশ্রয় নেন। আর ঢালী বাহিনীর অধিনায়ক মদনমল্ল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আরণ্যক অঞ্চলে আত্মগোপন করেন।

ঠিক এই সময়েই প্রতাপাদিত্যের জনৈক রাজকর্মচারী চন্দ্রকেতু দত্ত যশোহর থেকে পলায়ন করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আদিগঙ্গার তীরে জয়নগর মজিলপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলন শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা বলে জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এঁরই বংশে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম।

রাজা প্রতাপাদিত্যের পতন হওয়ার জন্য মানসিংহকে সাহায্য করেন তিন মজুমদার। ভবানন্দ, জয়ানন্দ আর লক্ষীকান্ত। অনেকে বলেন এঁরা প্রতাপাদিত্যের জরীপ ও রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

মানসিংহ ভবানন্দকে কয়েকটি পরগণার জমিদারী দান করেন। ভবানন্দ "রায়" উপাধি গ্রহণ করে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

করেন। মানসিংহের গুরু ছিলেন কামদেব ব্রহ্মচারী। এঁরই সন্তান লক্ষ্মীকান্ত। কামদেবের নির্দেশে মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তের অনুসন্ধান করেন। তাঁকে খুঁজে বার করে তাঁকেও জমিদারী দান করেন। এই লক্ষ্মীকান্ত বড়িষা, বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতাপাদিত্যের ঢালীবাহিনীর সেনানায়ক ও মাতলা নদীর নৌবহরের অধ্যক্ষ মদন দত্ত আদিগঙ্গার তীরবর্তী প্রসিদ্ধ কায়স্থ সমাজ-স্থান মাহিনগরের দুই ক্রোশ উত্তরে জঙ্গল হাসিল করে গড়ঘেরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর এঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। যশোহর নবদ্বীপ থেকে দাক্ষিণাত্য শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনপদে বসবাস করান। ফরিদপুরের কোটালী পাড়া থেকেও পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এই অঞ্চলে এসে মদন রায়ের বংশধরদের কাছ থেকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান গ্রহণ করেন।

সাধারণ লোকে ভূস্বামীকে 'রাজা' বলে। ভূস্বামী মদন রায় আর তাঁর বংশধরগণ যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই অঞ্চলটা আজও রাজপুর বলে পরিচিত। সংস্কৃত চর্চার জন্য অঞ্চলটার নাম হয়েছিল "দক্ষিণের নবদ্বীপ"। মদন দত্ত একবার স্বহস্তে একটা ভল্লুক বধ করে—প্রতাপাদিত্যের কাছ থেকে 'মল্ল' উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি 'রায়' উপাধি নিয়ে ভূস্বামী হয়ে বসেন। পরে ঢাকার নবাব দরবার থেকে 'রায়চৌধুরী' উপাধি তাঁর বংশধরগণ লাভ করেন।

একবার বাৎসরিক খাজনা দিতে বিলম্ব হওয়ায় মদন রায়কে ঢাকায় যেতে হয়। সঙ্গে নিয়ে যান মোবারক গাজী খাঁকে। এই মোবারক গাজী, বড় খাঁ গাজী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ছিলেন ভাঁটি অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বড় খাঁ গাজী সাহেবের মধ্যস্থতায় মদন রায় বিপদমুক্ত হন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মদন রায় বাঁশড়ার জঙ্গল হাসিল করে বড় গাজী মোবারক খাঁকে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। একটি পুষ্করিণীও খনন করিয়ে দেন। বাঁশড়ার বনে গড়ে উঠে বিখ্যাত ঘুঁটিয়ারী শরীফ।

বহু শত বিঘা পীরোত্তর সম্পত্তি শরীফের ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেন মদন রায়। কলিকাতা ক্যানিং ট্রেণপথে ঘুঁটিয়ারী শরীফ একটা ষ্টেশনও বটে। প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ ঘুঁটিয়ারী শরীফে ধর্মসম্মেলন হয়। দেশ-বিদেশের মৌলভী ফকিরেরা এখানে জমায়েৎ হন।

অম্বুবাচীর সময় হয় পীরের 'ফাতেয়া' উৎসব। এই উৎসবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পীরের ভক্তরা সমবেত হন। পীরের উদ্দেশ্যে শিরণি, মোমবাতি, গোলাপ জল উৎসর্গ করেন। ফাতেয়া উৎসবে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের প্রদত্ত শিরণি প্রথমে গৃহীত হয়। কারণ মদন রায়ের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজবল্লভ রায় রাজপুর পরিত্যাগ করে দু'ক্রোশ দক্ষিণে বারুইপুরে গমন করেন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে। যাবার সময় কুলদেবী আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যান।

বাঁশড়ার গাজীর গানে মদন রায়ের কথা আছে। চব্বিশ পরগণার একটি পরগণার নামও মদনমল্ল পরগণা। মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে আউলিয়া পীর ফকিরেরা এসে হিন্দুপ্রধান গ্রামের মধ্যে আস্তানা গাড়তেন। পাথরের বা মাটির তৈরী দেবতা বা তাদের মন্দির ভাঙ্গা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জনমন থেকে লোকদেবতাকে উৎখাত করা মোটেই সহজ নয়। তাই এই সব পীরদের স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে একটা আপস করতেই হতো। না হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার সহজ হত না। ভাঁটি অঞ্চলে বড় খাঁ মোবারক গাজীকে তাই সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে একটা আপস বন্দোবস্ত করে নিতে হয়েছে। প্রথমটা অবশ্য ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল দুজনের মধ্যে। দক্ষিণ রায়ের সৈন্যবাহিনী ছিল সুন্দরনের কেঁদো কাঁদো হলুদের উপর কালো ডোরা-কাটা বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। গাজী যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন দাউদা বলে তাঁর প্রিয় বাঘে চড়ে, আর দক্ষিণ রায় এলেন তাঁর প্রিয় বাঘ হীরার পিঠে সওয়ার হয়ে। দক্ষিণ রায়ের প্রবল বিক্রমে দলে দলে শত্রু

সৈন্য মরতে থাকে; কিন্তু গাজী সাহেব হাজার সাতেক বাঘ মেরে ফেলে দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। অবশ্য অলৌকিক ক্ষমতাবলে দক্ষিণ রায়ের কাটা মুণ্ড জোড়া লেগে যায়। এর পর একটা মিটমাট হয়। তখন বিধাতা পুরুষ আবির্ভূত হয়ে ব্যবস্থা দেন—ভাঁটি অঞ্চলের দুই অংশে দক্ষিণ রায় ও গাজী সাহেবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। উভয়ে উভয়কে মান্য করবেন। অন্য দেবতাদের মত গাজী সাহেবের কাছেও লোকে মাথা নোয়াবে। এরপর গাজী সাহেবের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের দোস্তি হয়ে যায়।

অনেকে বলেন দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা। কিন্তু অনেকের ধারণা এই দক্ষিণ রায় ছিলেন ভাঁটি অঞ্চলের এক রাজা মুকুট রায়ের পরাক্রান্ত সেনাপতি। এঁর অলৌকিক বীরত্ব এঁকে পরবর্তীকালে দেবতায় পরিণত করেছে। ইনি ধপধপি গ্রামের বাবাঠাকুর রূপে পূজা পাচ্ছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামগুলোতে পৌষসংক্রান্তিতে ও মাঘ মাসের গোড়ার দিকে দেহহীন একজোড়া মুণ্ডমূর্তির পূজা প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন এই মুণ্ডমূর্তি দক্ষিণ রায়ের কাটামুণ্ড। আবার কেহ বলেন, না, এই মুণ্ডমূর্তি ভাঁটি অঞ্চলের সুপ্রাচীন অনার্য দেবতা। বারাঠাকুর-এঁর নাম। সুন্দরবনের বাঘের হাত থেকে দক্ষিণঅঞ্চল বা দুয়ার রক্ষা করেন বলে এই দেবতাকে দক্ষিণ-দ্বারও বলে। মুণ্ডমূর্ত্তির দুটির একটিকে দক্ষিণ রায়ের ও অপরটিকে তাঁর মা নারায়ণী দেবীর প্রতীক বলে অনেকে মনে করেন।

এ ছাড়া আছেন কুমীরের দেবতা কালু রায়।

সুন্দরবন অঞ্চলের আরেক বিখ্যাত দেবতা বনবিবি। ভাঁটি অঞ্চলের অধিকার নিয়ে একবার দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। দক্ষিণ রায় এক বিধবার ছেলে দুখেকে অপহরণ করেন। দুখে তখন বনবিবির কাছে ধর্ণা দেয়। বনবিবি দক্ষিণ রায়ের কবল থেকে দুখেকে উদ্ধার করেন। দক্ষিণ রায় তখন তাঁর বড় দোস্ত মোবারক গাজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে তাঁর একটা

আপোষ মীমাংসা করে দিতে বলেন। গাজী সাহেবের মধ্যস্থতায় স্থির হয় নিম্নবঙ্গের আঠারো ভাঁটির মধ্যে বনবিবির কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে সকলকে। বোধ করি চণ্ডীদেবী এখানে বনদেবী বা বনবিবি রূপে পূজা পাচ্ছেন।

দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বাবাঠাকুর আর পঞ্চাননের প্রতিপত্তি এখনও বজায় আছে। দক্ষিণ রায়ের রাজ্য সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করার সময় মনি নদীর তীরে এক বিচিত্র মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলা দেশের মন্দির সাধারণতঃ চার চালা রীতিতে তৈরী হয়, কিন্তু এ মন্দিরটির গঠন দেখে পণ্ডিতেরা বলেছেন এটা উত্তর ভারতের নাগর নীতিতে গঠিত। এটি পাল যুগে নির্মিত। এ ধরণের মন্দির বাংলাদেশে আর দেখতে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকে এটাকে জটার দেউল বলে থাকে। জনশ্রুতি, এটা শিবের মন্দির ছিল। শিবের আর এক নাম জটাধর তাই মন্দিরটি জটার দেউল বলে খ্যাতি লাভ করেছে।

মন্দিরের কাছেই একটা তাম্রলিপি পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় জয়ন্তচন্দ্র নামে জনৈক রাজা ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কাছেই রায়দীঘি নামক গ্রাম থেকে পাথরের তৈরী সূর্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই মনে হয় সুন্দরবনের মধ্যেও একদিন সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছিল।

সুন্দরবনের কথা না বললে চব্বিশ পরগণার কথা অসম্পূর্ণ থাকবে। পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে অসংখ্য নদীবহুল আর্দ্র আরণ্যক অঞ্চল সুন্দরবন নামে খ্যাত। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সারা বিশ্বে সুপরিচিত। সমুদ্রতটের এই অঞ্চল আগে ব্যাঘ্রতটি-মণ্ডল নামে খ্যাত ছিল। সুন্দরবনের অরণ্যে গুড়া, বচ, সুঁদরী ইত্যাদি গাছের ঠাস বুনানী। তবে সুঁদরী গাছ খুব বেশী সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় বলে অরণ্যটি সুন্দরবন নামে অভিহিত।

অবশ্য অনেক পণ্ডিত বলেন জায়গাটার নাম আসলে চন্দ্রবন। সুন্দরবনের গহন অরণ্যের মধ্যে খুব বড় জীর্ণ প্রাসাদ আজও দেখতে পাওয়া যায়। বনের মধ্যে প্রকাণ্ড দীঘি আর তার ইটের তৈরী বাঁধান ঘাট দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনে হয় একদিন এখানে লোকালয় ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলের মাটির তলা থেকেও গুপ্ত, পাল আর সেন আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনে হয় ভূ-বিপর্যয়ে আর মগ ফিরিঙ্গী দস্যুদের উপদ্রবে সুন্দরবন মানুষ বাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

সুন্দরবনের অরণ্যে নরমাংস-লোলুপ বাঘ আর নদীনালা খাঁড়িতে ওৎ পেতে আছে হিংস্র কুমীর। ডাল ছড়ানো সিংওয়ালা, বাদামীর উপর শ্বেত চন্দনের মত ফোঁটা দেওয়া চিতল হরিণের দল চরে বেড়ায় বনে। কেওড়া গাছের সুগন্ধি ফুল আর পাতা তাদের বড় প্রিয়। গাছের ডালে ডালে বসে থাকে তাদের বন্ধু বানরের দল। তারা ফুল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলে। হরিণেরা মহানন্দে তাই খায়। বাঘের সাড়া পাওয়া মাত্র বানরেরা কিচির মিচির চিৎকার করে হরিণদের সতর্ক করে দেয়। হরিণরা নিমেষে হাওয়া হয়ে যায়। বাঘ এসে খাদ্য পালিয়েছে দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বানরদের দিকে চেয়ে রাগ প্রকাশ করে। দুষ্টু বানরগুলো গাছের অনেক উঁচু ডালে বসে বাঘের দিকে চেয়ে ভেংচি কেটে বেশ মজা করে। মাঝে মাঝে সরু খাল পার হবার সময় বাঘের ঠ্যাং কামড়ে ধরে কুমির। লাগে যুদ্ধ। তাই বাঘ পারতপক্ষে জলে নামে না।

সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতি বছরই কিছু লোক বাঘের কবলে পড়ে।

সুঁদরী গাছের সরল দীর্ঘ শক্ত কাঠ দিয়ে বিদ্যুৎবাহী তারের খুঁটি তৈরী হয়। সুন্দরবনের আর একটি খুব দরকারী গাছ হল গোল পাতা গাছ। এ গাছের পাতায় ঘরের ছাউনী দিলে অনেক বছর নিশ্চিন্তে কেটে যায়।

চব্বিশ পরগণার প্রাচীন ইতিহাস-বিখ্যাত কয়েকটি জায়গার কথা আগে বলা হয়েছে। আধুনিককালেও জেলাটির কয়েকটি স্থান খ্যাতি লাভ করেছে। বন্দুকের কারখানার জন্য ইছাপুরের নাম সকলে জানেন। কাঁকিনাড়া, জগদ্দল শিল্পাঞ্চল বলে বিখ্যাত।

এখন দমদমের বিমান বন্দরটি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। এখানে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ক্লাইভের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়েছিল ১৭৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। ইংরাজ আমলে এখানে সেনানিবাস ছিল। দিবারাত্র এখানে গোলা-গুলির দমাদম আওয়াজ পাওয়া যেত বলে এখানকার নাম হয় দমদম।

ইংরেজ আমলে মাতলা নদীর তীরে গড়ে ওঠে ক্যানিং শহর। এখানে একটা বন্দর তৈরী হয়েছিল। পাঁচটা জেটিও ছিল। বিরাট বিরাট চালকল ছিল ক্যানিং-এ।

ডায়মণ্ডহারবারের নামটি একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে প্রথম বৈদ্যুতিক তারবার্তা পাঠানো হয় কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবারে। ডায়মণ্ডহারবার বর্তমানে একটি মহকুমা শহর। এখানে পূর্ব রেলপথের একটা স্টেশন আছে। এটি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

ব্যারাকপুরে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক হতে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম গুলি বর্ষিত হয়। তারপরেই সে বিদ্রোহ সারা উত্তর ভারত ছড়িয়ে পড়ে। তারও আগে ইংরেজের বিরুদ্ধে বাঙালী কৃষকরা তিতুমীরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। গোবরডাঙার কাছে কৃষক বাহিনীর কাছে ইংরাজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার পরাজিত হন। এর পর তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরী করে ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে পরাজিত ও নিহত হন। অত্যাচারিত কৃষকরা এ সংগ্রামে আপাতত পরাজিত হয় বটে কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যেই তারা নীলকর অত্যাচারী সাহেব জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

ইংরাজ আমলে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন দুই বিদ্রোহী। তাঁরা অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহ করেননি। তাঁদের বিদ্রোহ ছিল গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতায় ভরা সমাজের বিরুদ্ধে। এঁরা রামমোহন আর বিদ্যাসাগর। কলিকাতা ছিল এঁদের আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। এঁদের কাছ থেকে যাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ্ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির জন্ম চব্বিশ পরগণায়।

হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম বিখ্যাত বোড়াল গ্রামে। এঁর পিতা নন্দকিশোর বসু রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত সচিব ছিলেন। হিন্দু কলেজে রাজনারায়ণের সহাধ্যায়ী ছিলেন কবি মধুসূদন দত্ত আর ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে রাজনারায়ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত ছিলেন। উপনিষদের অনুবাদ কার্যে ইনি মহর্ষিকে সাহায্য করতেন। আজীবন ইনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের অনুরাগী। এঁরই কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার প্রবর্তন করেন। ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই বোধ করি তাঁর সুযোগ্য দুই দৌহিত্র ঋষি শ্রীঅরবিন্দ আর বারীন্দ্র ঘোষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছেন। রাজনারায়ণ ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরাগী। তাই আপন ভ্রাতার বিবাহ বিধবার সঙ্গে দিয়ে সমাজে একঘরে হয়েছেন।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, হিন্দু-সমাজের সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে লড়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের সমর্থক হিসাবে বিধবা বিবাহ দিয়ে সমাজে নিগৃহীত হয়েছেন। ইনি জাতিভেদ মানতেন না। তাই আপন কন্যার অসবর্ণ বিবাহ দিয়ে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কাছে নিন্দিত হয়েছেন। এঁর মাতুল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

প্রেরণায় সোমপ্রকাশ বলে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫৮ সালে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের সংবাদ পত্র ক্ষেত্রে এমন সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন কাগজ আগে প্রকাশিত হয়নি। সংবাদপত্রে রাজনীতির চর্চা দ্বারকানাথই বাংলা ভাষায় প্রথম সুরু করেন। চাংড়ীপোতা গ্রামে আজও দ্বারকানাথের জীর্ণ গৃহ রয়েছে। এই গৃহেই আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম হয়েছিল।

হরিনাভি গ্রামের রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করেন। নাটকটির নাম কুলীন-কুল-সর্বস্ব। এঁর রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল মধুসূদন নাটক রচনার প্রেরণা পান।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য রাজদ্বারে এক আবেদন পত্র পেশ করেন। সেই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করে রামনারায়ণ সাহসের পরিচয় দেন। রাজপুর গ্রামের গিরিশ বিদ্যারত্নও 'বিধবা বিষম দায়' বলে একটি নাটক লিখে সমাজে নিগৃহীত হন।

হরিনাভির কয়েক মাইল দক্ষিণে মাহিনগরে ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বপুরুষের বাস। এঁর পূর্বপুরুষ গোপীনাথ বসু ছিলেন গৌড়ের নবাব হুশেনশাহের নৌ-সেনাধ্যক্ষ। আদি গঙ্গার উজান বেয়ে ইনি গৌড়ে যাতায়াত করতেন।

কাছেই চাংড়ীপোতা গ্রামে স্বদেশী যুগে বিপ্লবীদের একটা বড় গোপন কেন্দ্র ছিল। ভারতবর্ষের তৃতীয় রাজনৈতিক ডাকাতি এখানকার রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুষ্ঠিত হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটা আজো রয়েছে চাংড়ীপোতার পাশের গ্রাম কোদালিয়ায়। নিকটবর্তী ষ্টেশনটির নাম এখন সুভাষ গ্রাম। গার্ডেনরীচে রাজনৈতিক ডাকাতির পর বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় মোটরে করে উত্তরভাগে পলাতক হন। এই উত্তরভাগে এশিয়ার অন্যতন বৃহত্তম জলনিষ্কাশন পাম্প বসানো হয়েছে।

পৃথিবী বিখ্যাত বিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বৈপ্লবিক কার্যের ক্ষেত্র ছিল এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এই তিন মহাদেশ জুড়ে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর সুবিখ্যাত পথের দাবী গ্রন্থের সব্যসাচী চরিত্রের অনেক উপাদান মানবেন্দ্রনাথের জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন। এঁর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে কোদালিয়ায়। ইনি ছিলেন হরিনাভি স্কুলের ছাত্র।

আদি গঙ্গার তীরের মজিলপুরে শিবনাথ শাস্ত্রীর পৈতৃক ভিটা। এখানে আরেকজন কর্মী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ইনি উমেশ দত্ত।

যেবারে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, সেইবার ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। নারী-সমাজের উন্নতির জন্য ইনি প্রভূত কাজ করেছেন। মজিলপুরে এঁরই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী পড়তেন। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী তখন মজিলপুরে মাতুল গৃহে থাকতেন। উমেশ দত্ত প্রথম জীবনে রাজপুর ও পরে হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইনি বামাবোধিনী বলে মহিলা-সমাজের একটি মুখপত্র ৪৪ বছর ধরে সম্পাদনা করে গেছেন।

নৈহাটি-কাঁঠালপাড়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিমন্ত্র "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। ১৮৬৫ সালে বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মরত অবস্থায় এঁর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বইখানি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে একদিকে যেমন নতুন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করতেন অন্যদিকে তেমনি নিকৃষ্ট রচনাকে কঠিন সমালোচনা করে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় দিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রও বাংলা-সাহিত্যে মৌলিক স্রষ্টা রূপে সম্মানিত।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-শিষ্য। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের শেষ প্রতিনিধি ঈশ্বর গুপ্তের জন্মকাঁচরাপাড়ায়। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পিতামহের নিবাস ছিল কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে। বনগ্রাম মহকুমার ব্যারাকপুর গ্রামে পথের পাঁচালীর প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্ম। হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি রাজপুরে থাকতেন।

ভারতের রাষ্ট্রগুরুরূপে স্বীকৃত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস ছিল মণিরামপুরে। এখন তাঁর বাসগৃহে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

নবদ্বীপ ত্রিবেণীর মত ভাটপাড়ায়ও সংস্কৃত চর্চার খ্যাতি ছিল। এখানে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় পণ্ডিত বলে খ্যাতি ছিল। ভাটপাড়া অঞ্চলের প্রাচীন বাসিন্দা সদ্‌গোপ ও মাহিষ্যগণ। তখন বোধ করি এ অঞ্চলে ভাঁটগাছের প্রাচুর্য ছিল, তাই জায়গাটির নাম হয়েছিল ভাটপাড়া।

কেহ কেহ বলেন সিদ্ধপুরুষ অল্লাল ভট্ট যশোর থেকে গঙ্গাতীরে বাস করতে এলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জঙ্গল হাসিল করে গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লীর প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে একথা ঠিক ভাটপাড়ার পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদেরও আগে এখানে রাঢ়িশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আগমন হয়। বাদশাহের কাছ থেকে জনৈক রাঢ়ি ব্রহ্মণ দুর্লভরাম, হালদার উপাধি পান, সঙ্গে পান ভাটপাড়া গ্রামের জায়গীর।

এই হালদার বংশের নারায়ণ ঠাকুর তাঁদের গুরুবংশীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের ফরিদপুরের কোটালী পাড়া থেকে ভাটপাড়ায় আনেন। এই পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একাদশ শতাব্দীতে রাজা শ্যামলবর্মার আমলে উত্তরাপথের সরস্বতী নদীর তীর থেকে বাংলা দেশে আসেন। এঁদের শাস্ত্রচর্চার খ্যাতি থাকলেও উনবিংশ

শতাব্দীতে এঁরা রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল আন্দোলন-গুলিকে সমর্থন করতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন যাতে বিধিবদ্ধ না হয়, তার জন্য ইংরাজ সরকারের কাছে রক্ষণশীলদের তরফ থেকে আবেদনপত্র পেশ করা হয়। সেই আবেদনপত্রে ভাটপাড়া-ত্রিবেণী-নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা স্বাক্ষর করেন।

শ্রীচৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দের সাধনপীঠ খড়দহের গঙ্গাতীরে আজও রয়েছে। নিত্যানন্দ তখনও বিবাহ করেন নি। রয়েছেন পানিহাটিতে। সপ্তগ্রামের কোটিপতি গোবর্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস সংসারের সব সুখ-ঐশ্বর্য ফেলে এসে নিত্যানন্দের কাছে হাজির হন। নিত্যানন্দের অনুমতি নিয়ে তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে চিড়া-ভোগের আমন্ত্রণ জানান। চৈতন্যভাগবতে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। রক্ষণশীলতার যুগে এমন গণতান্ত্রিক পংক্তিভোজন ব্যবস্থা এর আগে কখনো হয়নি।

এই গঙ্গাতীরের হালিশহর আর এক সাধকের মাতৃভাবের সাধনায় গৌরবদীপ্ত। ইনি সাধক রামপ্রসাদ। কলিকাতায় ধনীগৃহে চাকরী করতে গিয়ে হিসাবের খাতায় সঙ্গীত রচনা করে বসেন, তাই চাকুরী করা হয়নি। গঙ্গাতীরে বসে প্রাণখুলে শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। সেদিনও গাইছেন। গঙ্গা নদীতে বজরায় বসে বায়ু সেবন করছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। এমন মধুর কণ্ঠ কানে যেতেই বিমোহিত হলেন। আদেশ দিলেন গায়ককে ডেকে আনতে।

গায়ক রামপ্রসাদ বজরায় এলেন। সিরাজ তাঁকে বললেন গান গাইতে। রামপ্রসাদ হালকা সুরের একটা গজল সুরু করতেই সিরাজ বিরক্ত হয়ে বললেন, না না, যা আগে গাইছিলেন সেই গান, গান। রামপ্রসাদ গাইলেন একটা শ্যামা-সংগীত। প্রীত সিরাজ তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যেতে চাইলেন। দিতে চাইলেন জায়গীর পুরস্কার। সবিনয়ে এই সাধকশ্রেষ্ঠ সিরাজের অনুরোধ ও উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন।

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও রামপ্রসাদকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ বলেছিলেন, কি হবে ধনে, মানে, অর্থ প্রতিপত্তিতে, ও তো আবর্জনা। মায়ের সেবা করেই পর্ণকুটিরে জীবন কাটিয়ে গেছেন সাধক রামপ্রসাদ।

এই হালিশহরেই বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পৈত্রিক ভিটা রয়েছে। সম্পর্কে ইনি ছিলেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মাতুল। এই কুমারহট্ট-হালিশহরের সন্তান ঈশ্বর পুরী। এঁর কাছে গয়াতে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে রাণী-রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দেবী ভবতারিণীর মন্দিরের পঞ্চবটি তলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ সে কালের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা। অতি তরুণ বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই আসতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের টানে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রেরণা পেয়েই তিনি নতুন ভারত গড়ার কাজে আত্মদান করে গেছেন। দক্ষিণেশ্বর নয়া ভারতের নতুন তীর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগ এসেছেন চব্বিশ পরগণা থেকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজ) জন্মস্থান বসিরহাট মহকুমার শিকড়া কুলীন গ্রামে। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এই এই জেলার সুসন্তান।

দক্ষিণেশ্বরের কাছেই আড়িয়াদহে অন্নদা ঠাকুরের আদ্যাপীঠ সারা দেশের ভক্ত মানুষদের আকর্ষণ করে আনছে।

ভৌগোলিক হিসাবে কলিকাতা নগরী চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে অবস্থিত। তাই কলিকাতায় যে প্রগতিশীল ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে, তা সবার আগে গ্রহণ করেছে চব্বিশ পরগণা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নব জাগরণ হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে অনেকেরই জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলায়। কলিকাতা নগরীতে যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তার প্রথম সুযোগ

পেয়েছিলেন চব্বিশ পরগণার মানুষ। তাই ইংরাজী ভাষার আধারে যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এসেছিল তা এ জেলার মানুষই প্রথমে আত্মস্থ করে শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সারা বাংলা দেশের মধ্যে গরীয়ান হয়ে ওঠেন।

তাই দেখা যায় সারা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির নেতৃত্ব করেছেন এমন মানুষ—কলিকাতা-সন্নিহিত হুগলী আর চব্বিশ পরগণা জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন বেশী।

১০



নদীয়া

নদীয়া নামের উৎপত্তি নিয়ে একটি বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে। ভাগীরথীর এক নির্জন দ্বীপে গভীর রাত্রে এক সন্ন্যাসী নয়টি দিয়া বা দীপ জ্বেলে মানুষকে বসবাসের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে জায়গাটার নাম হয়েছিল নদীয়া।

সারস্বত-সাধনার ক্ষেত্র নদীয়াকে ১৭৭২ সালে বোধ করি প্রথম জেলা বলে গণ্য করা হয়। তখন প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বলা হ'ত নদীয়া বিভাগ। ১৮৬০ সালে নদীয়া বলে একটি ছোট জেলার সৃষ্টি করেন বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব। তারপর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে প্রায় অর্ধাংশ নদীয়া জেলা থেকে ছিন্ন করা হয় র‍্যাডক্লিফের ছুরিতে। এখন দুটি মাত্র মহকুমা নিয়ে নদীয়া জেলা গঠিত। জেলাটির উত্তরে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা, পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমে ভাগীরথী নদী।

নদীয়া জেলার বেশীর ভাগ অঞ্চল পলিমাটিতে তৈরী। হালকা দো-আঁশ মাটিতে ভিজে ভাবটা বেশীক্ষণ থাকে না। তবে উত্তর দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে নেমে আসা কালচে রঙের ভূ-ভাগকে বলা হয় কালান্তর অঞ্চল। এতে আমন ধান খুব ভালই ফলে।

নদীয়ার নদী বলতে পশ্চিমে জেলার সীমায় ভাগীরথী আর তাতে মিশেছে জলঙ্গী। এই দুই নদী নবদ্বীপ শহরের কাছেই মিলিত হয়েছে। এখান থেকেই ভাগীরথীর নাম পাল্টে হয়েছে

হুগলী। এ নাম পর্তুগীজদের দেওয়া। নদীয়ার আরেক বিখ্যাত নদী মাথাভাঙা, এর এক শাখা দক্ষিণ দিকে বেঁকে চূর্ণী আর ইছামতী নামে দু'শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। ভাগীরথীতে মেশে চূর্ণী আর ইছামতী নদীয়ার পূর্ব্ব দিকের সীমা নির্দেশ করে বনগ্রামের মধ্যে দিয়ে চব্বিশ পরগণায় প্রবেশ করে।

এই ইছামতীর কথা লিখে গেছেন প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নানা রচনার মধ্যে। 'ইছামতী' বলে তাঁর একটা উপন্যাস রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে।

নদীয়ার শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বিখ্যাত হ'চ্ছে চিনির কারখানা। রামনগরে এই কারখানা বসেছে। নদীয়ার গৌরব কিন্তু কুটির-শিল্পে। শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের ছিল দেশ জোড়া খ্যাতি। তবে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল নদীয়ার খ্যাতি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণনগরের পুতুল সাগরপারের দেশে রপ্তানী হয়ে বিদেশী সংস্কৃতিবান পরিবারের ড্রইং রুমে শোভা পাচ্ছে বর্তমান কালেও।

নদীয়ার অতীত ইতিহাস গৌরবে সমুজ্জ্বল। এই নদীয়াতেই একদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা।

এই নদীয়ার গঙ্গাতীরে শেষ বয়স কাটাবেন বলে সেন রাজবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের বয়স তখন আশি পার হয়েছে। তাঁর বীরত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু শেষ বয়সে শাস্ত্রচর্চা নিয়েই মগ্ন থাকতেন। তাঁর রাজসভায় সেকালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এমন সময় খবর এল মুহম্মদ ঘোরী বলে এক তুর্কী বিশ্বাসঘাতক জয়চাঁদের সহায়তায় চৌহান-বীর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেছেন। তাতে ভয় পাননি লক্ষ্মণ সেন ; কারণ তাঁর সৈন্যদল ছিল শক্তিশালী। কাজেই তিনি নির্ভয়ে গৌড় ছেড়ে নবদ্বীপে শাস্ত্রচর্চায় কাল কাটাতে লাগলেন।

এদিকে চারিদিক থেকে সংবাদ আসতে লাগলো মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী পূর্ব-ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কেউই তার অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারছে না। রাজসভার ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীরা ভবিষ্যৎ বাণী করে বসলেন, এক কুদর্শন দীর্ঘবাহু বামনাকৃতি মানুষ বঙ্গ বিজয় করবে।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে বসে রাজা লক্ষ্মণ সেন আহার করছেন, এমন সময় আঠারজন ঘোড়সওয়ার এসে রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়াল। প্রহরীরা তাদের পথ আটকাল।

দলনেতা অতি চতুর, বললে আমরা দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে এক জরুরী বার্তা নিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে এসেছি। প্রহরীরা আর বাধা দিল না। আঠারজন অশ্বারোহী প্রাসাদে প্রবেশ করে হঠাৎ তূর্যধ্বনি করল, কাছেই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিল সৈন্যদল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাসাদের উপর। সামান্য কয়েকজন প্রহরী আর প্রাসাদভৃত্য তরবারীর আঘাতে ভূমিশয্যা নিল।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন গোলমাল শুনে আহার ত্যাগ করে উঠে গবাক্ষ পথে এক অতি কুৎসিত চেহারার একজন খর্বাকৃতি মানুষ দেখলেন। তাঁর দীর্ঘবাহু প্রায় তাঁর হাঁটু স্পর্শ করেছে, ইনিই বখতিয়ার খিলজী। বুঝলেন, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণী ফলতে চলেছে। নিরুপায় রাজা লক্ষ্মণ সেন পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রাসাদের গোপন সুড়ঙ্গপথে বেরিয়ে ভাগীরথী নদীতে রক্ষিত দ্রুতগামী ছিপে করে পূর্ববঙ্গের দিকে পালালেন। নদীয়া মুসলমানদের করায়ত্ব হল।

অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছু আউলিয়া পীর ফকির এসে নবদ্বীপ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করে জনমতকে প্রভাবিত করেছিল। তারপর চারশ' বছর কেটে গেল। বাংলাদেশের ভূঁইঞা-শ্রেষ্ঠ বীর প্রতাপাদিত্য দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা

করতে তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক মানসিংহকে পাঠালেন। বিপুল সৈন্যদল নিয়ে মানসিংহ নৌকা করে নদীয়ার চাকদহে এলেন।

যশোহরে যাবেন অথচ পথঘাট ভাল চেনেন না। তখন ভবানন্দ মজুমদার বলে নদীয়ার এক ব্যক্তি—অনেকে বলেন ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের একজন কানুনগো ছিলেন—মানসিংহকে পথের নক্সা তৈরী করে দিলেন, যাতে তিনি অতি সহজে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধনঘাট আক্রমণ করতে পারেন।

মোঘলসৈন্য ভবানন্দের বাত্‌লে দেওয়া গোপন পথে যশোহরের দিকে এগুলো, এমনি সময় স্থুরু হল দারুণ ঝড়জল। মানসিংহের সৈন্যদের রসদও এদিকে গেছে ফুরিয়ে। এবার ভবানন্দ নিজের গোলা উজাড় করে দিলেন মোঘলসৈন্যদের খাওয়াতে। মানসিংহ জানালেন, এ সাহায্যের কথা তাঁর মনে থাকবে।

ধুমঘাটের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের হল পরাজয়। মানসিংহ দিল্লী যাবার পথে ভবানন্দকে সঙ্গে নিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে মহারাজা উপাধি আর ছ'টি পরগণার জমিদারী দিলেন। এই ভবানন্দই, মহারাজা ভবানন্দ রায় নাম নিয়ে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতাকামী প্রতাপের বংশের বিলুপ্তি ঘটে আর স্বজাতি-দ্রোহীর বংশ পুরুষানুক্রমে রাজভোগের অধিকারী হল।

শতবর্ষ পরে ভূষণার সীতারাম রায়ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে সপরিবারে ধ্বংস হন আর তাঁর বিরুদ্ধাচারী পুটিয়া নাটোরের জমিদারগণ ঢাকার নবাবকে সাহায্য করে সীতারামের রাজ্য ভাগ করে নেন। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান!

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই নদীয়া সীমান্তে পলাশীর আম্রকুঞ্জে ইংরাজ বণিকদের সেনাপতি ক্লাইভের হাতে সিরাজের পরাভব ঘটে।

তখন ভবানন্দ রায়ের বংশের কৃষ্ণচন্দ্র রায় নদীয়ার রাজা। তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায় ছিলেন। ইংরাজ খুশী হয়ে তাঁকে

পুরস্কার দিলেন পলাশী যুদ্ধের বারটি কামান। কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে আজও সেই কামানগুলো আছে।

কৃষ্ণনগরের রাজসভায় কৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানী-গুণী কবি পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এনে বিক্রমাদিত্যের মত নবরত্ন সভার সৃষ্টি করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়কে দিয়ে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়ে পূর্বপুরুষ ভবানন্দ রায়ের কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই বিদূষক গোপাল ভাঁড় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সরস রসিকতার জন্য সারা বাংলাদেশে আজও অমর হয়ে আছেন। এঁর বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরের কাছেই ঘূর্ণি গ্রামে।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় নবদ্বীপের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা বিদ্যাসাগরের শত্রুতা করেন। একবার তিনি নদীয়ায় এলে তাঁকে রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়ি এনে ভাত রেঁধে খেতে অনুরোধ করেন। উচ্ছিষ্ট মাটির হাঁড়িতে যেমন রেঁধে খেতে প্রবৃত্তি হয় না তেমনি একজনের পরিত্যক্ত বিধবাকে গ্রহণ করা যায় না এই ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণদের যুক্তি। যুক্তিটা যে অসার তা বালকেও বুঝতে পারে।

গোঁড়ারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ করলেও সাধারণ মানুষ তাঁকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন। শান্তিপুরের তাঁতীরা তাঁদের কাপড়ের পাড়ে লিখেছিলেন, 'বেঁচে থাকুন বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে।' আর সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়। বিধবা বিবাহ-আইন পাশের জন্য যে আবেদন পত্র বিদ্যাসাগর ইংরাজ সরকারের কাছে পেশ করেন তাতে স্বাক্ষর করেন শ্রীশচন্দ্র। বোধ করি এই পুণ্যে নদীয়ার রাজবংশ আজও বঙ্গদেশে সম্মানিত।

বিধবা-বিবাহ আইন যে বছর পাশ হয় তার বছর খানেক পরেই সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। নদীয়ায় সে বিদ্রোহের আঁচ লাগেনি। তারপর ১৮৫৯ সালে নীলবিদ্রোহ ঘটে নদীয়া, এবং যশোহর অঞ্চলে।

আগে কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরী হত না। নীল গাছের চাষ হত। সাহেব জমিদাররা গরীব চাষীদের অগ্রিম টাকা দাদন দিয়ে জোর করে তাদের পাট অথবা ধানের জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। না চাষ করলে অকথ্য অত্যাচার করত। এই নীলচাষী সাহেব জমিদারদের বলা হত নীলকর। এদের অত্যাচারে নদীয়ার চাষীরা ক্ষেপে উঠে নীলকর সাহেবদের নীলকুঠি পুড়িয়ে দেয়। বর্শা, লাঠি আর সড়কী নিয়ে রুখে দাঁড়ায় নিগৃহীত মানুষ।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তাঁর নীলদর্পণে বর্ণনা করেছেন। এই বই ইংরাজীতে অনুবাদ করেন মহাকবি মধুসূদন দত্ত। এই গ্রন্থ প্রকাশ করে খ্রীস্টান মিশনারী রেভারেণ্ড লঙ্-এর কারাবাস ঘটে। কলকাতার সুবিখ্যাত সাংবাদিক হরিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। ফলে সারা দেশের দৃষ্টি নদীয়ার দরিদ্র নীলচাষীদের প্রতি পড়ে। শেষ অবধি এদের অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং নীলকররা পাততাড়ি গুটিয়ে নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলা থেকে পলায়ন করেন।

নদীয়ার কথা বলতে বসে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রাজবংশের গল্প শোনালে নদীয়ার সঠিক পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকবে। মধ্যযুগে নদীয়ায় বিদ্যা ও জ্ঞানের যে অনুশীলন হয়েছে তা শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

নদীয়ার বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। ইংরাজরা যখন এদেশে আসে তখনও নবদ্বীপের বিদ্যার খ্যাতি অম্লান।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কোন শিক্ষিত কর্মচারী নবদ্বীপকে বাংলার অকস্‌ফোর্ড বলে বর্ণনা করেছেন। পলাশী যুদ্ধের আমলেও নবদ্বীপের 'বুনো রামনাথের' খ্যাতি ছিল সারা বঙ্গদেশ জুড়ে। অতি দরিদ্র এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নগরের বাইরে বনের ধারে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতেন। তাই লোকে তাঁকে 'বুনো রামনাথ' বলত। ব্রাহ্মণ হলেও কারো কাছে কোন দান তিনি গ্রহণ

করতেন না। নির্লোভ এই মহাপণ্ডিত তেঁতুলপাতার ঝোল আর মোটা চালের ভাত খেয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন। বিদ্যার দম্ভ ছিল তাঁর, অবশ্য সে দম্ভ দিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না। যাঁরা দয়া দেখাতে আসতেন, তাঁরাই সে দম্ভের বর্মে ঘা খেয়ে ফিরে যেতেন।

কৃষ্ণনগরের রাজা একবার তাঁর কুটিরে এসেছিলেন কিছু দান করার অভিপ্রায়ে। রাজা পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কিছু অনুপপত্তি আছে কিনা? এখানে অনুপপত্তি অর্থে তিনি সাংসারিক অভাব অনটনের কথাই বলতে চাইলেন। কিন্তু ভাব ভোলা পণ্ডিত উত্তর দিলেন চারখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করেছি আর তো কিছুতে অনুপপত্তি আছে বলে বোধ হয় না। পণ্ডিতমশায় এখানে উপপত্তি বলতে সিদ্ধান্ত বোঝাতে চাইলেন। রাজা তখন সোজাসুজি তাঁকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করতে চাইলেন। বলা বাহুল্য ক্রুদ্ধ হয়ে পণ্ডিত তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর গৃহিণীও ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী। গঙ্গার ঘাটে তিনি একদিন স্নান করতে গেছেন। পরণে লালপাড়ের মোটা শাড়ী, হাতে তাঁর লাল কড় মাত্র, এয়োস্ত্রীর চিহ্ন। সেদিন কৃষ্ণনগরের রাণীও গঙ্গাস্নানে এসেছেন, সঙ্গে কত দাসী। পাল্কীর বেয়ারার দল আর পাইক-বরকন্দাজেরা জায়গাটা সরগরম করে রেখেছে।

রামনাথ-গৃহিণী প্রকাণ্ড ঘাটের একপাশে নিঃশব্দে স্নান করে মাটির কলসিতে জল ভরে উঠে যাবেন এমন সময় রাণীর এক দাসী তাঁকে তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠল, "কো গো তুমি? তোমার সাহস তো কম নয়। দেখছ রাণী মা এসেছেন, আর তুমি কিনা জল ঘোলা করতে গেলে।"

পণ্ডিত-গৃহিণী শান্ত স্বরে বললেন, "দেখ বাছা, ভদ্রভাবে কথা বল, আমি তোমার চেয়ে মানে ও বয়সে ঢের বড়।"

ধনীর বাড়ীর দাসদাসীরা এমনিতেই একটু উদ্ধত হয়। এ তো আবার রাণীর দাসী। সে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, "আ, গেল যা। হাতে তো ঐ একগাছি লাল কড়, তার দেমাগ্ কত।"

ব্রাহ্মণী হেসে বললেন, "তুই মূর্খ স্ত্রীলোক। এই লাল কড়ের মর্ম বোঝার সাধ্য তোর নেই। এই কড় যতদিন আমার হাতে থাকবে, ততদিন নবদ্বীপের যশ থাকবে।"

এই বুনো রামনাথকে কলকাতার ধনীশ্রেষ্ঠ রাজা নবকৃষ্ণ একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ ছিল—দক্ষিণ ভারত থেকে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসে বাংলা দেশের পণ্ডিতদের তর্কে আহ্বান করেছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আর নবদ্বীপের শিবনাথ বাচস্পতি পরাজিত হয়েছিলেন সেই দক্ষিণী পণ্ডিতের কাছে। বাংলা দেশের সম্মান যায় যায়। সবাই নবকৃষ্ণকে বললেন, এ পণ্ডিতকে হারাতে পারেন নবদ্বীপের বুনো রামনাথ। তাকে আনবার ব্যবস্থা করুন।

রামনাথ আসতে চাননি—কলকাতাকে তাঁর বড় ভয়—এখানে ভোগ আর বিলাসের ফাঁদ পাতা—ওখানে গেলে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন শুনলেন বাংলাদেশের সম্মান বিপন্ন তখন রাজী হলেন।

বলা বাহুল্য দক্ষিণী পণ্ডিত নবদ্বীপের দরিদ্র বুনো পণ্ডিতের কাছে পরাজিত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন। রামনাথও আর একদণ্ড অপেক্ষা করেননি। কিছু আহার না করেই তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে কলকাতা ত্যাগ করেন।

বুনো রামনাথের জন্মেরও শ' আড়াই বছর আগে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মেছিলেন নদীয়া-দুলাল নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্য নামে যাঁর সারা ভারতে পরিচয়।

সেদিন বাংলার দারুণ দুর্দিন। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে দলে দলে মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে, ভোগ-বিলাসের স্রোতে সমাজ আবিল হয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে চলেছে চূড়ান্ত ভণ্ডামী। সেই সময় সংসারের সকল সুখ অবহেলায় ত্যাগ করে নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস নিয়ে হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বিপুল মনীষা আর চরিত্র বল সম্বল করে প্রায় একাকী বিরুদ্ধ

শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে দেশ ও জাতিকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। সংসার ত্যাগ না করে কি সমাজের মঙ্গল করা যেত না। এ প্রশ্ন তাঁকে করেছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম পুরীতে। সারা ভারত প্রায় ছ' বছর ধরে পায়ে হেঁটে পর্যটন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। অধঃপতিত ভারতের চেহারা দেখে তাঁর দু' চোখে জল ঝরেছে অবিরল ধারায়। পুরীতে গিয়ে তিনি জগন্নাথ মন্দিরের সামনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অপূর্ব কান্তি তরুণ সন্ন্যাসীকে আপন গৃহে নিয়ে যান ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। তিনিও নদীয়ার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ইনি মিথিলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের কাছে ন্যায় অধ্যয়ন করে কাশীতে বেদান্ত পড়তে যান। সেখান থেকে শাস্ত্রচর্চার সুবিধা হবে ভেবে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়ে পুরীতে বাস করতে থাকেন। বাসুদেব, শ্রীচৈতন্যকে আপন গৃহে আশ্রয় দেন। সেখানে শাস্ত্রীয় বিতর্কে শ্রীচৈতন্যের কাছে পরাজিত হয়ে বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের কাছে নতি স্বীকার করেন। তিনিই বলেছিলেন কথাটা,—'গৃহে থেকেই সমাজ-সংস্কারে বাধা কোথায় ?'

শ্রীচৈতন্য হেসে বলেছিলেন, "তাহলে লোকে আমার কথা শুনত না,—ভোগীর কথার মূল্য সামান্য।" সত্যই যাঁরা সব ছেড়েছেন—সব ভোগ, সব আসক্তি তাঁদেরই মানুষ হৃদয়ে ধারণ করেছে চিরদিনের জন্য। তাই বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণ মৃত্যুহীন প্রাণ।

শ্রীচৈতন্যের কথায় মনে পড়ে রঘুনাথ শিরোমণির কথা। 'কানা রঘুনাথ' বলে সারা বাংলায় তিনি পরিচিত। নব্যন্যায়ের স্রষ্টা বলে যিনি সারা ভারতে সম্মানিত, তিনি ছিলেন নিমাই-এর সহপাঠী। অতি দরিদ্রের সন্তান। আশা করতেন চতুষ্পাঠীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোন রাজসভায় পাবেন পণ্ডিতের পদ। কিন্তু দেখা গেল নিমাই থাকতে তাঁর সে আশা ফলবতী হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ নিমাই দৈবলব্ধ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। পরীক্ষার দিন একই নৌকায় চলেছেন দু'জন।

সেদিন মৌলিক রচনাপত্র পেশ করার দিন। যাঁর রচনা সর্বোত্তম হবে, তিনিই লাভ করবেন সভাপণ্ডিতের লোভনীয় রাজকর্ম।

নৌকায় বসে নিমাই আপন রচনা পড়ে শোনালেন রঘুনাথকে। শুনে ম্লান হয়ে গেলেন রঘুনাথ। চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে লাগল। নিমাই কারণ জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পেরে অবহেলা ভরে তাঁর শ্লোক লিখিত পুঁথি গঙ্গায় ফেলে দিলেন।

স্তম্ভিত রঘুনাথ বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। এই রঘুনাথও প্রতিভাশক্তিতে অন্য কারো চেয়ে কিছু কম ছিলেন না।

অল্প বয়স থেকে তাঁর পাঠে এত মনোযোগ ছিল যে একবার আকাশের দিকে চেয়ে নক্ষত্র দেখে জ্যোতিষ-চর্চা করছিলেন, এমনি সময় একটি বিষাক্ত পোকা চোখে পড়ে—ফলে একটি চোখ তাঁর চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। এই কানা চোখ নিয়ে মিথিলার পক্ষধর মিশ্র আর তাঁর ছাত্রেরা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন। কারণ ঈর্ষা। নদীয়ার এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান যা শোনেন তা আর ভোলেন না,তাঁর কাছে গুরুও তর্কে এঁটে উঠতে পারেন না, বারবার পরাজিত হন। কাজেই তর্কে হেরে একদিন গুরু আপন মর্যাদা ভুলে রঘুনাথকে কটু ভাষায় 'কানা' বলে গালি দিলেন। সে গালাগালি রঘুনাথের মর্মে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি স্থির করলেন গুরুকে সে রাত্রে হত্যা করবেন নয়তো মনে শান্তি পাবেন না।

একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে গুরুর গৃহে উপস্থিত হলেন। সেদিন পূর্ণিমা। পত্নীর সঙ্গে পক্ষধর তখন আলাপ করছিলেন।

পত্নী বললেন, দেখ প্রভু, চাঁদের কি সুন্দর শুভ্র আলো।"

গুরু সেদিন কিছু অন্যমনস্ক,—বললেন, "এ চাঁদের আলোর চেয়ে শুভ্র সুন্দর আলো আমি দেখছি।"

বিস্মিত পত্নী বললেন, "কোথায় প্রভু?"

পক্ষধর শান্তস্বরে বললেন—সে রঘুনাথের প্রতিভায়। আজ তাকে বড় কটু কথা বলেছি, মনটায় তাই শান্তি পাচ্ছি না।

রঘুনাথ সব শুনে অস্ত্র ফেলে ছুটে এসে গুরুর পায়ে পড়লেন।

মিথিলার দাম্ভিক পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করলেন বাঙালী তরুণ শিষ্যের কাছে। তাই কবি সত্যেন দত্ত লিখে গেছেন—

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষপাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি।

সেদিন থেকে নবদ্বীপে ন্যায়চর্চার জয়যাত্রা সুরু হল। আগে মিথিলা ছাড়া আর কোথাও ন্যায়ের উপাধি দেবার অধিকার ছিল না। এবার থেকে নবদ্বীপ সে অধিকার লাভ করল।

বাসুদেব আর রঘুনাথ ছিলেন শ্রুতিধর। তাঁরা মিথিলা থেকে সব ন্যায়ের গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে এনে পরে পুঁথিতে লিখে ফেলেন। ফলে মিথিলায় আর ন্যায় পড়তে যাবার দরকার হত না।

কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ সড়ক বা গোয়াড়ীতে এসেছিলেন সু-পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত পড়তে। কয়েক মাস এখানে থেকে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। এখানে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম।

নদীয়া অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিদ্যাচর্চার জন্য সারা বাংলা দেশের কাছে এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে বহুকাল। তার স্মৃতি, তার ন্যায়, তার বৈষ্ণবধর্ম-সাধনা শুধু বাংলাদেশের নয় সারা ভারতের গৌরবের বস্তু। ইতিহাসের নির্দেশে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও আধুনিক কালের খণ্ডিত ক্ষুদ্র নদীয়া জেলা আবার নতুন ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। জ্ঞান-সাধনায়, জাতীয়-চেতনায়, সাহিত্য সংস্কৃতি-চর্চায় নদীয়ার নাম আবার প্রোজ্জ্বলভাবে বাঙালীর হৃদয়ে মুদ্রিত হচ্ছে।

১১

মুর্শিদাবাদ

বাংলাদেশের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ জেলাটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। মুর্শিদাবাদের পলাশী প্রান্তরে "একদিন বণিকের মানদণ্ড, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে পোহালে শর্বরী।"

কেউ বলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নাম থেকেই জেলাটির নাম হয়েছে মুর্শিদাবাদ। আবার অনেকে বলেন মুর্শিদাবাদের নামকরণ হয়েছে নানকপন্থী সাধু মুকস্থদন দাসের নাম থেকে। গৌড়ের নবাব হোসেনশাহ একবার খুব পীড়িত হয়ে পড়েন। জীবনের আশা ছিল না। সাধু মুকস্থদন তাঁর অলৌকিক যোগ-প্রভাবে নবাবের রোগমুক্তি ঘটান। নবাব প্রীত হয়ে সাধুকে নিষ্করভূমি দান করেন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে। কালক্রমে সাধুর নাম থেকে জায়গাটার নাম হয় মুকস্থদাবাদ। সে নামও লোকমুখে পরিবর্তিত হতে হতে মুর্শিদাবাদ নাম ধারণ করে। স্থানীয় জনশ্রুতি বলে, মুর্শিদাবাদ নামের উৎপত্তি হয়েছে চুনাখালির মুকস্থদ আলীর নাম থেকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনভার এসে পড়ল, তখন তাঁরা মুসলমান আমলের চাক্‌লা ও পরগণা-ভিত্তিক শাসন বাতিল করে বিভাগ ও জেলাভিত্তিক শাসনের প্রবর্তন করেন। কাজেই বাংলাদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদ অঞ্চলটিকে একটি জেলার রূপ দেওয়া হয়। দুশো বছর আগে মুর্শিদাবাদ জেলার আকার ছিল প্রকাণ্ড। জেলাটির দক্ষিণে ও পূর্বে নদীয়া,

পশ্চিমে বীরভূম আর সাঁওতাল পরগণা। জেলাটির উত্তর সীমায় গঙ্গা বা পদ্মানদী পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করে রেখেছে। নূরপুরের কাছে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী বেরিয়ে জেলাটির মধ্যে দিয়ে বয়ে যেখানে নদীয়ায় প্রবেশ করেছে সেখানেই বিখ্যাত পলাশী গ্রাম। আগে গঙ্গার জলে ভাগীরথী সারা বছর নৌচালন-যোগ্য থাকত; কিন্তু নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য গঙ্গার জল আর ভাগীরথীতে পড়ে না। ফলে ভাগীরথীর স্রোত যাচ্ছে শুকিয়ে, চড়া জাগছে তার বুকে। কলকাতা বন্দরেও বড় বড় জাহাজ আসতে পারছে না, তাই ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে বইয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এখন ভাগীরথীতে জল ঢেলে দিচ্ছে ছোটনাগপুর থেকে আসা বাঁশলা আর পাগলা নদী। বাঁশলা আর পাগলা মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের কাছে আর শক্তিপুরের কাছে দ্বারকানদী ভাগীরথীতে মিশেছে। এ ছাড়া রয়েছে জলাঙ্গী নদী মুর্শিদাবাদ আর নদীয়া জেলার সীমানায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিল আর ঝিলের অভাব নেই। বিখ্যাত হিজল বিল রয়েছে ময়ূরাক্ষী আর দ্বারকা নদীর কাছে। ভৈরব নদী আর জলাঙ্গীর মোহনার নিকট রয়েছে কালান্তর বিল। মুর্শিদাবাদের কাছে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রখ্যাত হীরাঝিলের তীরে সিরাজদ্দৌলার প্রমোদভবন ছিল।

জেলাটির পশ্চিমদিকে বীরভূম। তাই বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ কাঁকর-ভরা লাল মাটি ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে দেখা যায়। এ অঞ্চলে পাহাড় নেই, আছে ঢেউ খেলানো উঁচু প্রান্তর। সেখানে অজস্র ঝরণার ধারা, তবু সেখানে চাষবাস ভাল হয় না। চাষ ভাল হয় ভাগীরথীর পূর্বদিকে। গঙ্গা আর জলাঙ্গীর পলিমাটিতে এ অঞ্চলের ভূমি উর্বর। গাঢ় কাল রংএর মাটিতে তৈরী কালান্তর অঞ্চল জেলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদে নদী ও বিলের সংখ্যা যেমন একটু বেশী, এ জেলার দীঘির সংখ্যাও কম নয়। রাজা মহীপালের আমলের সাগরদীঘি

বিখ্যাত। সাগর নামে এক কুম্ভকারের কোদালের ঘায়ে এ দীঘিতে প্রথম জল উঠেছিল বলে, তারই নামে দীঘির নাম হয়েছে। শেখেরদীঘি কাটিয়েছিলেন গৌড়ের নবাব হোসেনশাহ। হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। হোসেনশাহ সৈন্যদের সুবিধার জন্য গৌড় থেকে পুরীর রাজপথের পাশে পাশে দীঘি খনন করান। তেমনি একটি দীঘি শেখেরদীঘি।

রমনাদীঘিটা নাকি খনন করিয়েছিলেন সুবিখ্যাত রাজা আদিশূরের পুত্র অনুশূর।

মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্পের খ্যাতি ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজারে ইংরেজরা রেশমকুঠি স্থাপন করে। তাদেরও আগে থেকে ওলন্দাজ, ফরাসী আর আর্মেনীয় বণিকেরা এসে মুর্শিদাবাদে জাঁকিয়ে বসে রেশমের কারবার চালাচ্ছিল। তারা কূটবুদ্ধি বণিকজাতি ইংরেজের কাছে হটে যায়। মুর্শিদাবাদের রেশমের কারবারে আধিপত্য লাভ করে ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কলিকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ছিলেন কাশিমবাজারের রেশমকুঠির মালিক। তিনি একলক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড রেশমের কারবারে খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। নবাব আলিবর্দ্দী ইংরেজদের কাছে বছরে শুধু রেশম শুল্ক আদায় করতেন সাড়ে সাতাশি লক্ষ টাকা।

মুর্শিদাবাদের সিল্কের কাপড়ের মত মসলিনের খ্যাতিও ছিল। ঢাকার মসলিনের সঙ্গে তার ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে মুর্শিদাবাদের রেশমী বস্ত্র ও মটকা আজও তার খ্যাতি বজায় রেখেছে। মীর্জাপুর, বালুচর, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গার রেশমী শাড়ীতে নবাবী আমলে নায়েব নাজিমদের ছবি বোনা হত। এমন দিনও গেছে যখন লোকে বেনারসী শাড়ীর চেয়ে মুর্শিদাবাদের মীর্জাপুরী বস্ত্রের বেশী আদর করেছে। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ রেশমের কারবার খুলেছিলেন মুর্শিদাবাদে।

নবাবী আমলে হাতীর দাঁতের শিল্প গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদে।

সে যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ শিল্পটিরও আজ অন্তিম দশা। মুর্শিদাবাদের কাঁসার শিল্পেরও একদিন কদর ছিল। আজ সে শিল্পও মৃতপ্রায়। শিল্পের কথা বলতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের আমের কথা না বললে খুব ভুল হবে। নবাবদের আমলে মুর্শিদাবাদের আম শিল্পদ্রব্যের পর্যায়ে উঠেছিল।

মুর্শিদাবাদে ভাল আমের চাষ বরাবর হত। নবাবরা বাইরে থেকে নানা জাতের আমের কলম আনিয়ে যত্ন করে চাষের বন্দোবস্ত করেন। মুর্শিদাবাদের কোহিতুর আমের তুলনা নেই। এ আম টুসী বা জালতির সাহায্যে পেড়ে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রেখে বাঁশের ধারালো চ্যাচাড়ীর সাহায্যে কাটতে হয়, নয়তো এর স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। আনানা আমটি ক্ষীরের সঙ্গে খাওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবেই এর স্বাদ পাওয়া যাবে। আমের নামই বা কত রকমের কালা পাহাড়, লাজুক বদন, নবাব পছন, বেগমবিলাস। নবাব-বেগমরা যে আমের সমঝদার ছিলেন আমের নামেই তার প্রমাণ।

জেলাটির কৃষি, শিল্প প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এবার পুরাতন ইতিহাসের গল্প শোনাই। পলাশী প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করেছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ক্লাইভ। অতি হিসাবী ইংরাজ বণিকেরা মুর্শিদাবাদের নবাবী গদী দখল করলেও তাতে নিজেরা না বসে, বসিয়েছিলেন সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে। সর্ত ছিল বহু লক্ষ টাকা মীরজাফর দেবেন ক্লাইভকে। কিন্তু মীরজাফর ক্লাইভের টাকার লালসা মেটাতে পারেননি, তাই তাঁকে পদচ্যুত করে ক্লাইভ মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে মুর্শিদাবাদের নবাবী দেন। মীরকাশিম নির্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজ কোম্পানিকে অস্ত্রবলে এদেশ থেকে না হটালে তারা এ দেশের সর্বনাশ করবে। তাই তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে বিহারের মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করে বিলাতী প্রথায় সৈন্যদের সুশিক্ষিত করে তুলছিলেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা ছিল আরও চতুর। তারা

মীরকাশিমের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে আবার বৃদ্ধ মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা শাসন ও শোষণ করতে থাকে। তারপর একদিন ১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দেখতে দেখতে মুর্শিদাবাদের খ্যাতি ম্লান হয়ে আসে, নতুন রাজধানী কলকাতার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন বাংলার সুবাদার আওরঙ্গজেবের পৌত্র অজিমউশ্বানের দেওয়ান। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী। আজিমউশ্বান রাজস্ব আদায়ের জটিল ব্যাপারগুলো ভালো বুঝতেন না। এদিকে মুর্শিদকুলী খাঁ এসব ব্যাপারে ছিলেন ঝানু কর্মচারী। বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খাঁর উপর ছিলেন ভারি সন্তুষ্ট। কারণ, মুর্শিদকুলী খাঁ প্রজাদের উৎপীড়ন করে খাজনা আদায় করতে ছিলেন খুব মজবুত। প্রতি বছর নগদ এক কোটি টাকা নগদ পাঠাতেন দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আলমগীরের কাছে। ফলে বাংলা দেশে নগদ রূপার টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। হাটেবাজারে কেনা-বেচার কাজে কড়ির ব্যবহার সুরু হয়। তাই আজও বলা হয় 'টাকা-কড়ি'।

মারাঠা-কেশরী শিবাজীর সেনাদের কাছে বার বার পরাজিত হয়ে অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রায় উন্মাদ অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের এক পল্লী-গ্রামে তাঁবুর মধ্যে আওরঙ্গজেব মারা যান। খবর পেয়ে অজিমউশ্বান দিল্লী ছুটে যান। আর মুর্শিদকুলী ভাগীরথী তীরে রাজধানী তৈরী করে প্রায় স্বাধীন ভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকার্য চালাতে থাকেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর পরে নবাব হন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা। তারপর তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। সরফরাজকে পরাজিত করে তাঁরই আশ্রিত আলীবর্দ্দী, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী গদী দখল করেন।

আলীবর্দ্দীর আদরের নাতি অস্থিরচিত্ত তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার

আচরণে ক্ষুব্ধ প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলমান তাঁকে গদীচ্যুত করার জন্ম ইংরাজ-বণিকদের সঙ্গে চক্রান্ত করেন। চক্রান্তের ফলে সিরাজ পলাশী প্রান্তরে পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে বিশ্বাসহন্তা মীরজাফর-পুত্র মীরণ।

ভাগীরথীর অপর তীরে খোশবাগে সিরাজ তাঁর দাদু আলিবর্দ্দীর পাশে আজও শুয়ে আছেন। জনশ্রুতি প্রতি সন্ধ্যায় সিরাজের সাধ্বী পত্নী লুৎফা স্বামীর কবরে দীপ জ্বেলে দিয়ে যেতেন আমৃত্যু। তিনিও সিরাজের পাশের কবরে শায়িত।

রাজধানীরূপে মুর্শিদাবাদের আয়ু অত্যন্ত অল্প, মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছরের। নবাবী আমলে বেশ কয়েকটি প্রাসাদ মসজিদ তৈরী হয়েছিল আজও সেগুলি দর্শনীয়। পর্যটকগণ মুর্শিদাবাদ শহরের ইমামবাড়া, খোশবাগ, মোবারক মঞ্জিল, মোতিঝিল দেখে অতীতের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

গঙ্গাতীরে হাজারদুয়ারী প্রাসাদ নির্মাণ করেন নবাব হুমায়ুঁজা ১৮৩৭ সালে। তিনি ছিলেন ইংরাজদের বৃত্তিভোগী। ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে ন'বছরে এই প্রাসাদটি তৈরী হয়। এটি এখন সরকারী তত্ত্বাবধানে একটি যাদুঘরে পরিণত।

মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক গ্রামের কাছে কর্ণসুবর্ণ ছিল মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানী। এই রাঙ্গামাটির বেশীর ভাগ আজ ভাগীরথী নদী গ্রাস করেছে।

চীনা পরিব্রাজক হুয়েনসাং শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন। তিনি এখানকার সঙ্ঘারামগুলোয় দু'হাজার বৌদ্ধশ্রমনকে বাস করতে দেখেছিলেন। এই কর্ণ-সুবর্ণে গুপ্তবংশীয় রাজারা বহুদিন রাজত্ব করেছেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ইষ্টক স্তূপ থেকে বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। হয়তো এখানকার মাটি খুঁড়লে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানা যেতে পারে। পরবর্তীকালে পাল-সেন যুগেও ঐ অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ছিল। গয়ামাবাদ থেকে

হুগলীর ত্রিবেণী পর্যন্ত তার নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে। পাঠান আমলের কীর্তিচিহ্নগুলো দেখা যায় জঙ্গীপুর থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে। মোগল আমলে মুর্শিদাবাদ আবার নতুন করে জেগে ওঠে। বাংলার রাজধানী হবার সৌভাগ্য লাভ করে।

মুর্শিদাবাদের কাছেই মহিমাপুর ছিল বাংলা দেশের ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠের বাড়ী। জগৎ শেঠ নাম নয় উপাধি।

মুর্শিদাবাদের কথা বলতে গিয়ে জগৎ শেঠদের কথা না বললে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। রাজপুতনার যোধপুর থেকে আগত মাণিকচাঁদের ভাগিনেয় ফতেচাঁদ দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদশাহের কাছ থেকে জগৎ শেঠ উপাধি পান। এই উপাধি পরে বংশগত হয়ে পড়ে। জগৎ শেঠেরা ছিলেন অগাধ টাকার মালিক, তাঁদের বাড়িতে ছিল টাকশাল। সিরাজদ্দৌলা জগৎ শেঠের কাছে তিন কোটি টাকা চান। জগৎ শেঠ দিতে অস্বীকার করলে সিরাজ শেঠকে অপমান করেন। সে অপমান জগৎ শেঠ হজম করেন নি।

ইংরাজ-মীরজাফরের চক্রান্তে যোগ দিয়ে তিনি সিরাজের পতন ঘটান। অবশেষে মীরকাশিম মুঙ্গেরে জগৎ শেঠকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।

বিদেশী বণিকের দল এসে মুর্শিদাবাদে ঘাঁটি করে। এক কাশিমবাজারেই ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ আর্মেনীয় বণিকদের বাণিজ্যের কুঠি তৈরী হয়।

সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করলে কান্তবাবু বলে এক ভদ্রলোক হেষ্টিংস-এর প্রাণ রক্ষা করেন। পরে হেষ্টিংস গভর্নর জেনারেল হলে কান্তবাবুকে জমিদারী দেন। এই কান্ত বাবুই কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দানবীর মনীন্দ্র নন্দী এঁদের ভাগিনেয় বংশের সন্তান।

গোবরনালায় ছিল নবাবের তোপখানা। এখানকার জনার্দন কর্মকারের তৈরী প্রসিদ্ধ কামানটির নাম জাহানকোষা। এটি ১৮ ফুট লম্বা আর এর বেড় ৪½ ফুট।

মুর্শিদাবাদে প্রাচীন মন্দির ও পীঠস্থানের অভাব নেই। বেলডাঙা থানার প্রসিদ্ধ কপিলেশ্বর শিবের মন্দিরটি রাজা আদিশূরের সময়ে ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বলে অনেকে মনে করেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ডাহাপাড়ায় কিরীটকণা গ্রামে কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দিরে বিমলাদেবী প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি এই কিরীটকণা গ্রামে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হয়ে সতীদেবীর কিরীটের এক কণা পড়েছিল। তাই নাকি এ গ্রামের নাম কিরীটকণা। এটিও একটি পীঠস্থান বলে গণ্য। কালীঘাটের খ্যাতি যখন সারাদেশে পরিব্যাপ্ত তখন মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী দেবীর কথাও সারা বাংলা দেশের লোক জেনেছিলেন।

জিয়াগঞ্জের পুরাতন নাম গাণ্ডীলা। এটা ছিল জৈনধর্মাবলম্বীদের আশ্রয়স্থল। বৈষ্ণবরাও পরবর্তীকালে এখানে তাঁদের মঠ নির্মাণ করেছিলেন।

অজিমগঞ্জের কাছে বড়নগরে নাটোরের সুবিখ্যাত রাণীভবানী অনেক মন্দির নির্মাণ করেন। বড়নগরকে বাংলা দেশের কাশী বলা হয়।

শ'দুয়েক বছর আগে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভগবান-গোলায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার বসতো। এখান থেকে তূলা রেশম নীল আর তৈল পৃথিবীর নানা দেশে চালান যেত।

ইংরাজ আমলে মুর্শিদাবাদের চেয়েও খ্যাতিলাভ করে বহরমপুর। এখানকার রেশমকুটির খ্যাতি অনেকদিনের। বর্তমানে ভারত সরকার রেশম-শিল্প গবেষণার জন্য একটি সেরিকালচারাল গবেষণা কেন্দ্র তৈরী করেছেন বহরমপুরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এখানে একটি সৈন্যনিবাস ছিল। এই সৈন্যনিবাসে ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু ইংরেজরা খবর পেয়ে সৈন্যদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেয়। কাজেই বিদ্রোহ সফল হতে পারেনি। সেই সৈন্যনিবাসে জেলখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের বহু প্রখ্যাত বিপ্লবী এই জেলখানায় যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

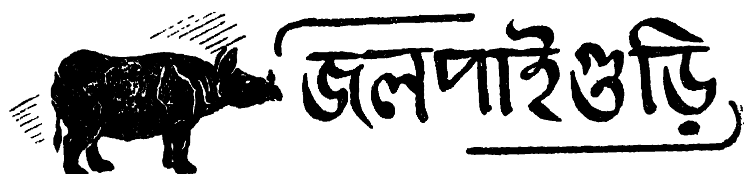
কাটিয়েছেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। এই বহরমপুরে চাকুরী করার কালে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুবিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জঙ্গীপুরের শরৎ পণ্ডিত দা-ঠাকুর নামে সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত। সাতাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দরিদ্র এই মানুষটি সামান্য সম্বল নিয়ে হাতে চালানো প্রেস থেকে 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে দেশের অন্যায়কারীদের শায়েস্তা করেছিলেন। এঁর 'বিদূষক' পত্রও দেশের রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলকাতায় গিয়ে ইনি নিজে রাস্তায় রাস্তায় কাগজ ফেরী করতেন। চারিত্রিক তেজে ইনি আধুনিককালের বিদ্যাসাগর ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

অতীতের ইতিহাসের ঐশ্বর্য নিয়ে বর্তমান কালের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে জেলাটি।

আগ্রহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্কুল কলেজ খোলা হচ্ছে, পথঘাটের উন্নতি হচ্ছে। গঙ্গার উপর ফরাক্কা বাঁধ বাঁধা হলে জেলাটি দ্রুত সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে।

১২



পশ্চিমবঙ্গের এক বিচিত্র জেলা জলপাইগুড়ি। উত্তরে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ গিরিশিখর, সারা বছরই যার শিখর সাদা তুষারে ঢাকা।

জলপাই নামে ফলের গাছ থেকেই, জলপাইগুড়ি নামের উৎপত্তি। স্থানীয় লোকেরা এই কথাই বলেন। মনে হয় এ অঞ্চলে প্রচুর জলপাই গাছের বন ছিল। আর উত্তর বাংলায় গ্রামকে গুড়ি বলা হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে ভুটান রাজ্য। পূর্বদিকে আসাম প্রদেশ। উত্তর ও পশ্চিমে দার্জিলিং, দক্ষিণ দিকে কোচবিহার। জেলাটির উত্তরে ভুটানের পার্বত্য অঞ্চল এসে প্রবেশ করলেও আসলে জলপাইগুড়ি হিমালয়ের নিম্ন সমতলভূমিতে অবস্থিত। এখানকার মাটিতে পাথর ও মোটা বালির দানা মেশানো। তিস্তা আর জলঢাকা নদীর মধ্যভাগে শক্ত রকমের কালচে মাটি দেখা যায়।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে যে ত্রিস্রোতা নদীর কথা বলা হয়েছে তার স্থানীয় নামই তিস্তা। এই তিস্তা ছাড়াও, মহানন্দা জলঢাকা, তোরসা প্রভৃতি নদী জলপাইগুড়ির বুক দিয়ে বয়ে গেছে।

তিস্তা এক দুরন্ত নদী। বর্ষার সময় কামানের আওয়াজের মত গুম গুম্ ভয়ংকর শব্দ শোনা যায় তার বুকে। জলঢাকা নদী নেমে

এসেছে ভুটান থেকে। নদীটা খুব চওড়া হলেও অগভীর তাই বর্ষার সময় জলঢাকা নদীতে তুফান ওঠে, তার গতিও হয় তীব্র। তোরসা বয়ে এসেছে তিব্বত থেকে ভুটানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে। অসংখ্য উপনদী মিলেছে তার সঙ্গে। এই তিন নদী উত্তরবঙ্গের ভীতির কারণ। প্রায়ই বর্ষাকালে বন্যার ঢল নামে এগুলিতে। বর্তমানে জলঢাকা নদীর স্রোত থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরী করে উত্তরবঙ্গে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে নানা কারখানা ও যন্ত্র-শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বেশীর ভাগ জায়গা এক সময় প্রাচীন কামতাপুর বা কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ডুয়ার্স অঞ্চলটি ছিল ভুটানের মধ্যে। ভুটানী ভাষায় ডুয়ার্স অর্থে দুয়ার দ্বার বা সীমান্ত। বৃটিশ অধিকারের আগে ভুটিয়ারা ডুয়ার্স অঞ্চলকে কোচবিহার রাজ্য থেকে দখল করে নেয়। আর ভুটিয়াদের হাত থেকে ১৮৬৫ সালে ইংরাজরা ডুয়ার্স এলাকা কেড়ে নেয়। ইংরাজরা ডুয়ার্স এলাকাকে পূর্ব ডুয়ার্স ও পশ্চিম ডুয়ার্স এই দুই ভাগে ভাগ করে। পূর্ব ডুয়ার্স আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয় আর পশ্চিম ডুয়ার্সকে করা হয় স্বতন্ত্র জেলা। এই স্বতন্ত্র জেলাই জলপাইগুড়ি।

'রাজাভাতখাওয়া' নামটি বড়ই কৌতুকজনক। বক্সা বন-বিভাগের একটা দপ্তর এখানে আছে। এখান থেকে শাল, শিশু, খয়ের প্রভৃতি চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। জায়গাটির এমন অদ্ভুত নাম কেন হল সে সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতি হল, একবার ভুটিয়া-রাজের সঙ্গে কোচবিহার রাজার যুদ্ধ হয়। পাশাপাশি রাজ্য বলে এমন যুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকতো। যুদ্ধ শেষ হলে শান্তি স্থাপিত হয়। কোচবিহাররাজ পরম প্রীতিভরে ভুটিয়ারাজকে আমন্ত্রণ করলেন। ভুটিয়ারাজ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই স্থানটিতে এসে কোচবিহাররাজ প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করলেন। সেই থেকে জায়গাটির নাম হল 'রাজাভাতখাওয়া।' ভুটান সীমান্তে বকসাগ্রাম। আগে

এখানে একটা সেনানিবাস ছিল। ইংরাজ আমলে সেই সেনানিবাস রাজবন্দীশালায় পরিণত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু তরুণ তাঁদের যৌবনের মূল্যবান দিনগুলো এখানে কাটিয়ে গেছেন।

জলপাইগুড়ির 'জলপেশ' একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের জল্পেশ্বর শিবের মন্দির শ' তিনেক বছর আগে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ তৈরী করে দিয়েছিলেন।

এ সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে চলে আসছে। হাজার দুই বছর আগে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুরের (আধুনিক কালের গৌহাটি) রাজা জল্পেশ্বর গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন বোধ করি কোন বন্য প্রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করে। অকস্মাৎ তার চোখে পড়ে যায় এক বিচিত্রদর্শন শিবলিঙ্গের দিকে। অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় এটি পড়েছিল।

রাজা জল্পেশ্বর শিবলিঙ্গটিকে অশেষ যত্নে নিয়ে এসে মন্দির নির্মাণ করে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের নামেই শিবের নামকরণ করেন জল্পেশ্বর শিব। দেখতে দেখতে এই জাগ্রত শিবের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটি বিখ্যাত শৈবপীঠ গড়ে ওঠে এখানে। আজও শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলা বসে। মেলা চলে প্রায় একমাস অবধি।

রাজা জল্পেশ্বরের তৈরী মন্দির আর নেই বটে কিন্তু গ্রামটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিবের নাম আজও ধারণ করে আছে। শিবমন্দিরের কাছেই রয়েছেন বাসুদেবের মূর্তি অন্য একটা মন্দিরে। মনে হয় সারা বাংলাদেশেই শৈবধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্মও একদিন বিস্তার লাভ করেছিল।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থাগার, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার অভাব নেই জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্র পাঠাগার আর রামকৃষ্ণ পাঠাগার বিখ্যাত। আলিপুর দুয়ারের সুভাষ পাঠাগার, পাণ্ডাপাড়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লাইব্রেরীর বেশ নাম আছে।

শহর থেকে একটি মাসিক শিশু ও কিশোর সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "ডানপিটেদের আসর"। শিশু ও কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'ডানপিটেদের আসরের' খ্যাতি আছে। পত্রিকাটি তারই মুখপত্র।

মালদহের গম্ভীরাগানের মত জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলের লোকসংগীত গমীরাগানের খ্যাতি আছে। গম্ভীরাগানের মত গমীরাগানের কেন্দ্রীয় পুরুষ দেবাদিদেব মহাদেব। প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিব প্রতিষ্ঠার সময় থেকে গমীরা গায়ক বাড়ী বাড়ী গমীরাগান গেয়ে বেড়ান।

উত্তর বাংলার এই ক্ষুদ্রকায় জেলাটির কয়েকজন মানুষ সারা বাংলাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এক সময়। জলপাইগুড়ির "ঋষি সান্যাল মশাই" জয়চন্দ্র সান্যাল স্বদেশী যুগে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারাবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ষাট। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করে সেকালের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইংরাজী আর ফার্সী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। তাই যখন জলপাইগুড়িতে স্বদেশী যুগে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, তখন এঁরই ছোট ভাই সাধনচন্দ্র সেই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হন। জয়চন্দ্রের পুত্র গণেশচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনের আমলে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল স্বদেশী যুগে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি কলিকাতা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী জলপাইগুড়িতে বহন করে আনেন। প্রকাশ করেন 'জনমত' বলে একটি সাপ্তাহিক পত্র।

প্রসন্নদেব রায়কত জলপাইগুড়ির সন্তান। প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত শৈববংশে এঁর জন্ম। বাংলা সরকারের মন্ত্রীপদ পেয়েছিলেন একবার। দানশীলতার জন্য সারা বাংলাদেশে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

জলপাইগুড়ির রায়কত ও সান্যাল পরিবারের মত দাশগুপ্ত পরিবারেরও খ্যাতি আছে। স্বদেশী যুগের বিশিষ্ট দেশকর্মী ঈশানচন্দ্র

দাশগুপ্ত। পরে এঁর পুত্রগণও জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত হলেও বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঢেউ হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই জেলাটিকেও আন্দোলিত করেছে। তাই দেখা যায় কেশব দত্তের মত ত্যাগী আদর্শবান মানুষ সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চলে স্বদেশী প্রচার করে বেড়িয়েছেন বৃটিশের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে। বিদেশী শাসক বারবার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা-স্পৃহাকে খর্ব করতে পারে নি। অসহযোগ আন্দোলনের টানে জগদীন্দ্র দেব রায়কতের মত মানুষ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজে ইস্তফা দেন। ইনি ছিলেন কোচবিহার মহারাজার দেহরক্ষী। তাঁর লেখা একখানি আত্মজীবনী আছে। তাতে তাঁর জ্ঞানের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সেইকালের একটা চিত্রও বেশ ফুটে উঠেছে।

নবাব মশারফ হোসেনের নাম বাংলাদেশে বেশ পরিচিত। অখণ্ড বাংলায় কয়েকবার মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। দানশীল ব্যক্তি হিসাবে নাম আছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে এমন অনেক কৃতী মানুষ রয়েছেন যাঁরা এই জেলার সন্তান।

জলপাইগুড়িতে উপজাতীয় লোক রয়েছে নানা জাতের। এদের দুভাগে ভাগ করা যায়। এক—ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহলী, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি। আর দুই—মেচ, লেপচা, ভাটিয়া, রাভা, গারো প্রভৃতি। প্রথম উপজাতিগুলি প্রটো-অষ্ট্রালয়েড শ্রেণীতে আর দ্বিতীয় উপজাতিগুলি মঙ্গোল শ্রেণীতে পড়ে।

এরা ছাড়া রয়েছে বিচিত্র "টোটো" আদিবাসীরা। জলপাইগুড়ি জেলা আর ভুটান রাজ্যের সীমায় তোরসা নদীর তীরে এদের বাস। বাঁশের মাচার উপর ঘর বেঁধে এরা থাকে। ইফসা বলে দেবতার পূজা করে। দেবতার কাছে পশুবলি দেয়। 'ঝুম চাষ' টোটোদের

প্রধান উপজীবিকা। লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে এতদিন তারা জানতো না।

টোটোরা ভুট্টা, দুধ, দই খেতে ভালবাসে। নানা রকমের মাছ-মাংসে তাদের আগ্রহও কম নয়। ভুটান থেকে আনা মাটির বাসনে তারা আগে ভোজন করতো। এখন তাদের মধ্যে এনামেলের বাসনের প্রচলন হয়েছে।

এই টোটোরা মারামারি ঝগড়াঝাঁটি একেবারে পছন্দ করে না। নেপাল থেকে অনেক নেপালী এসে এদের মধ্যে বাস করছে, এরাও তাদের বাধা দেয় না। টোটোদের মত জলপাইগুড়ির আরেকটি বিচিত্র শ্রেণী রাভারা। এরা আদিবাসী নয়, উপজাতি শ্রেণীভুক্ত। এরাও জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে ছোট ছোট কুঁড়েঘরে বাস করে। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচের বাইরে এরা বাস করে। তাই প্রাচীন অনেক প্রথা ও বিশ্বাস এদের মধ্যে টিকে আছে।

জলপাইগুড়ির মেচ উপজাতির লোকেরা থাকে সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে।

মেচরাও রাভাদের মত 'ঝুম চাষ' করতো। এখন ঝুম চাষ বন্ধ রেখে চা-বাগানে ও সাধারণ কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়েছে। জলপাইগুড়ির অরণ্যে আজও টিকে আছে পৃথিবীর আদিমতম প্রাণীদের অন্যতম বিচিত্র জীব গণ্ডার। বাংলাদেশের আর কোথাও গণ্ডারের দেখা মেলে না।

একদিকে পার্বত্য অঞ্চল আর অন্যদিকে নদীর পলিতে গড়া সমতল ভূমি, এই নিয়ে গড়া জলপাইগুড়ি। জেলার শহর অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার বেড়েই চলেছে। সমাজ সচেতন, জাতীয় আন্দোলন অতীত দিনের মত আজও পূর্ণভাবে বর্তমান জেলাটিতে। পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীরাও অনেক দিনের পুরাতন অনেক সংস্কার ত্যাগ করে সভ্যতা আর সংস্কৃতির আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। জেলাটি নানা দিক দিয়ে আজ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

দিনাজপুর

মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে একখণ্ড সরু ফালি জমি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার সঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার যোগসাধন করেছে। ওটি পশ্চিম দিনাজপুরের নূতন অংশ। ১৯৫৬ সালে যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলো নতুনভাবে গঠন করা হয়, তখন বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ, গোপালপুর আর ইসলামপুর থানার ৯০৬টি গ্রাম পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দিনাজপুর জেলার বেশী অংশ ইংরাজ শাসকদের চাতুরীতে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ছুরিতে কাটা পড়ে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে। জেলাটির পশ্চিমদিকে বিহার, দক্ষিণে মালদহ ও পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান আর উত্তরে দার্জিলিং আর পূর্ব পাকিস্তান।

দিনাজপুরে এক রকমের মাটি দেখা যায় তাকে বলে খয়রা মাটি। এ মাটিতে একবার মাত্র ফসল ফলে। দো-আঁশ পলিমাটিও আছে এ জেলায়, সে মাটির রঙ ছাই-এর মতো, তাতে ভালো ফসল ফলে। জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ বাহিনী আত্রাই, পুর্ণভবা, টাঙ্গন ও মহানন্দা। সারা জেলা জুড়ে অসংখ্য বিল আর পুকুর রয়েছে।

দিনাজপুরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে দার্জিলিং-গোদাগাড়ি সরকারী রাস্তা। মুসলমান আমলে এ পথ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর

বঙ্গের জেলাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অনেকগুলি পথ তৈরী হয়েছে। রেলপথ জেলাটিতে নেই বললেই হয়। কাটিহার থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত একটা রেলপথ আছে।

আধুনিককালে বালুরঘাটে একটা বিমানবন্দর তৈরী হয়েছে। অখণ্ড দিনাজপুরের দু'হাজার বছরেরও বেশী গৌরবময় অতীত ইতিহাস রয়েছে।

প্রাচীন গৌড়রাজ্যের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে ছিল দিনাজপুরের অবস্থান। গৌতমবুদ্ধ নাকি এ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়, (দিনাজপুর জেলা,) বিখ্যাত হয়েছিল জৈনগুরু ভদ্রবাহুর জন্মস্থান হিসাবে।

এই ভদ্রবাহু ছিলেন মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরু। ভদ্রবাহুর মৃত্যুর পর জৈনধর্ম নানা সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি শাখার নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। এই তাম্রলিপ্তি শাখার নাম থেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের নামকরণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক যুগেরও আগে মহাভারতের আমলে এই পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির মধ্যে ছিল পুণ্ড্র বাসুদেবের রাজ্য। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

গুপ্তরাজারা একদিন অধিকার করেছিলেন বরেন্দ্রভূমির এই শ্রেষ্ঠ অঞ্চলটিকে। তারপর রাজা শশাঙ্ক এই অঞ্চলটিকে আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সারা বঙ্গে আরম্ভ হয় দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। তখন বরেন্দ্রীর এক বীর দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি গোপালদেব। বঙ্গদেশে খাঁটি বাঙালী রাজবংশের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই বংশের রাজা মহীপাল দিনাজপুর অঞ্চলে যে রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ এই জেলার প্রসিদ্ধ মহীপালদীঘি।

এই দ্বিতীয় মহীপালের আমলেই বরেন্দ্রভূমিতে ইতিহাস বিখ্যাত কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়। সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মহাবীর দিব্বোক। এঁরই ভাইপো ভীমকে দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা

রামপাল পরাজিত করেন। রামপাল এই অঞ্চলে যে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তার নাম ছিল রামাবতী। রামাবতীর ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। গৌড়ের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করেছিলেন বখ্‌তিয়ার খলজী। দিনাজপুর অঞ্চলের বানগড়ের কাছে দেবকোটে তিনি আততায়ী আলীমর্দান কর্তৃক নিহত হন।

সেই মুসলমান অধিকারের যুগে একজন হিন্দু জমিদার নিঃশব্দে ক্ষমতা সঞ্চয় করে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন ১৪১৪ সাল নাগাদ। এই হিন্দু জমিদার ছিলেন দিনাজপুরের প্রভাবশালী ভূস্বামী দনুজমর্দনদেব বা রাজা গণেশ। ইনি স্বর্ণমুদ্রায়ও আপন নাম মুদ্রিত করে গেছেন। এঁর নাম থেকেই বোধ করি দিনাজপুর নামের উৎপত্তি। আকবর বাদশাহ বাংলাদেশকে চব্বিশটি সরকারে ভাগ করেন। এই চব্বিশটি সরকারের মধ্যে ছটি সরকারের অংশ পড়ে দিনাজপুরের মধ্যে।

এই আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে কাশী ব্রহ্মচারীর কাহিনীই প্রধান। আজও দিনাজপুর রাজবাড়ীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে কাশী ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে। ইনি অরণ্যের মধ্য থেকে একটি কালিকা মূর্তি পান। সেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর নামে প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি তিনি সংগ্রহ করেন। কাশী ব্রহ্মচারী শিষ্য শ্রীমন্তকে সম্পত্তি সমর্পণ করেন। শ্রীমন্তের দৌহিত্র শুকদেব মাতামহের ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এঁরই আমলে আওরঙ্গজেব-পৌত্র আজিমউশ্বান এঁকে রাজা বলে স্বীকার করে সনদ দান করেন। দিনাজপুরের রাজবাড়ীতে সে সনদ অনেক দিন পর্যন্ত ছিল।

শুকদেবের বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন প্রাণনাথ। দিনাজপুরের সুবিখ্যাত প্রাণসাগরদীঘি এঁরই নাম ধারণ করে আছে। মুর্শিদকুলী খাঁ এই সময় বাংলাদেশকে তেরটা চাকলায় ভাগ করেন। প্রাণনাথ একটা চাকলার অধিকার পেয়ে চাকলদার উপাধি লাভ করেন।

নবাব আলিবর্দীর আমলে যখন বাংলাদেশে মারাঠা বর্গীর উপদ্রব সুরু হয়, তখন প্রাণনাথ মারাঠাদের বিরুদ্ধে আলিবর্দীকে সাহায্য করেন। তাঁর পৌত্র রাধানাথের সময় দিনাজপুরের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ সুরু হয়। মুসলমান ফকিরেরাও সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে সুরু করেন।

বিব্রত রাধানাথ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে পত্র লিখে সাহায্য চান। হেষ্টিংস একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। একেই তো দত্তকপুত্র রাধানাথকে তিনি স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তার উপর রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা। তিনি দেবীসিংহকে দিয়ে খাজনা আদায়ের নামে দরিদ্র কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগলেন।

এমন সময় রামকান্ত রায় বলে রাধানাথেরই জনৈক আত্মীয় রাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। তাঁর চক্রান্তে রাজা রাধানাথের কয়েদ হ'ল বাকী খাজনার দায়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবার এগিয়ে এসে দিনাজপুর-জমিদারীর দায় গ্রহণ করলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ দিনাজপুর জেলায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে জেলাবাসীর মনে জাতীয়তার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন। স্থানীয় তরুণেরা গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯০৮ সালে প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির গোপন আখড়াও গড়ে ওঠে দিনাজপুর জেলায়।

সারা দিনাজপুর জুড়ে দেশপ্রেমের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। জেলাবাসীরা ঠিক করেছিলেন তাঁরা আর মামলা-মোকর্দমা করতে ইংরাজের তৈরী কোর্টে যাবেন না। নিজেরাই গণ-পঞ্চায়েত গঠন করে সালিশীর সাহায্যে বিরোধ বিসম্বাদের মীমাংসা করে নেবেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও দিনাজপুর পেছিয়ে থাকে নি। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই একাত্ম হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন ১৯২০ সালে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নির্দেশে বালুরঘাটে স্বরাজ্য পার্টির অফিস খোলা হয়। ১৯২৮ সালে যখন

এদেশে 'সাইমন-কমিশন' আসে তখন সারা দিনাজপুর প্রতিবাদে হরতাল পালন করেছিল। লবণ আইন ভঙ্গের যুগে ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর কারাবাসের প্রতিবাদে সারা জেলায় হরতাল পালিত হয়। ফলে ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকার বালুরঘাটের সব স্কুল কলেজের 'এড' বন্ধ করে দেয়। ফল হয় আরো ভয়ানক। সারা জেলায় 'নো ট্যাক্স কাম্পেন' স্বুরু হয়ে যায়।

সারা জেলার সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেদিন। স্থানীয় সাঁওতালরাও পেছিয়ে থাকে নি।

দিনাজপুরে বিখ্যাত বিপ্লবী লাঠিয়াল পুলিন দাস ইংরাজ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান ১৯২৪ সালে। তা সত্বেও গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা এ জেলাতে বরাবর বজায় ছিল। তাই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার সংগ্রামের বীর সৈনিকদলের কয়েকজন তরুণ ১৯৩৩ সালে দিনাজপুরের হিলি রেল ষ্টেশনে হাজির হয়েছিলেন গোপনে। পুলিশ তাদের চিনে ফেলে। ফলে হিলি রেল ষ্টেশনে চলে গুলি বিনিময়। তরুণ বিপ্লবীরা সেই গুলি বর্ষণের মধ্যেও জাতীয় পতাকা ষ্টেশনে উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকেন। শেষ অবধি তাঁরা আহত অবস্থায় বন্দী হন।

১৯৪২ সালের আগষ্ট গণ-বিপ্লবের আমলে মহাত্মা গান্ধী ইংরাজকে বলেছিলেন "কুইট ইণ্ডিয়া"—ভারত ছাড়। বিয়াল্লিশের সেই ভারত ছাড় আন্দোলনে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে ৮।১০ হাজার মানুষ জমায়েত হয় তারপর সেই মহা জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে। টেলিগ্রাফ পোষ্ট, রেলের লাইন উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রি অফিস, সিবিল কোর্টে আগুন ধরানো হয়। মদের দোকান ভেঙ্গে ফেলে জনতা গভীর ঘৃণায়। ইংরেজের মিলিটারী সৈন্য এগিয়ে আসে রাইফেল উঁচিয়ে। লুটিয়ে পড়ে কত মহাপ্রাণ। তারপর বহু মানুষের ত্যাগে আর সংগ্রামে আসে স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালে।

পশ্চিম দিনাজপুরের অতীত ইতিহাস গৌরবে সমুজ্জল।

জেলাটিতে ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানের অভাব নেই। দেবকোটে বখতিয়ার খলজী নিহত হয়েছিলেন। এই দেবকোটের কাছেই ছিল প্রসিদ্ধ বানগড়। মহাভারতের উল্লিখিত সহস্রবাহু বানরাজার দুর্গ ছিল এখানে। বানরাজার কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ হরণ করেছিলেন। ফলে রাজা বানের সঙ্গে কৃষ্ণের দারুণ যুদ্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণ বানের ৯৯৮টি হাত ছেদ করে দগ্ধ করেন। কাছেই করদাহ গ্রামটি আজও সেই কথা মনে করিয়ে দেয়।

বানগড়ের কাছে দুটি দীঘি আছে। একটির নাম কালোদীঘি অন্যটির নাম ধলোদীঘি। বানরাজার দুই পত্নী কালোরাণী আর ধলোরাণীর নাম থেকে দীঘি দুটির নামকরণ হয়েছে। প্রতি বছর এখানে একটা মেলা বসে।

তপনদীঘির তীরে বসে বানরাজা তর্পণ করতেন। তাই দীঘির নাম লোকমুখে বিকৃত হয়ে তপন হয়েছে। বানগড় জনপদটি অতি সুপ্রাচীন। এর মাটির তলা থেকে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই জেলার করণদীঘির ইতিহাসটি বড় বিচিত্র। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রজাতি দানবীর কর্ণকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এই দিনাজপুর অঞ্চলে। কর্ণ বা করণদীঘি সেই পৌরাণিক স্মৃতিকে আজও মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দিনাজপুরে আধুনিক যুগের আলো নিয়ে আসেন দু'জন খ্রীস্টান মিশনারী। ১৭৯৪ সালে মহীপাল দীঘির কাছে মদনাবতী বলে একটা স্থানে মিস্টার উইলিয়াম কেরী আর ডাক্তার টমাস বলে দু'জন খৃষ্টান মিশনারী নীলচাষ করার জন্য জমি কিনে ফ্যাক্টরী খুলে বসেন মদনাবতী জায়গাটা টাঙ্গন আর পুণর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

উইলিয়াম কেরী ছিলেন খৃষ্টান মিশনারী, বাংলাদেশে এসেছিলেন খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। কোন কারণে কলকাতায় তাঁকে বসবাস করতে দেওয়া হয়নি। তিনি মালদহ জেলার মিষ্টার উডনি বলে এক নীলকরের অর্থ সাহায্য নিয়ে দিনাজপুরের মদনাবতীতে নীল

চাষের কাজ সুরু করেন। বাংলা বই ছাপাবার জন্য একটা ছাপাখানাও মদনাবতীতে বসান।

খৃষ্টতত্ত্ব সাধারণকে বোঝাতে হলে বাংলা বাইবেলের প্রয়োজন, তাই বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে কেরী সাহেব ছাপিয়ে ফেলেন দিনাজপুরেই। কেরী সাহেব হয়তো খ্রীষ্টান মিশনারী কি নীলকর সাহেব রূপে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি কিন্তু বহু ভাষায় সুপণ্ডিত এই সাহেবটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল।

দিনাজপুরে যে একদিন লোককথা বা লোকসাহিত্যের প্রচার বেশ ভাল রকম ছিল তার প্রমাণ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত মনসামঙ্গল পুঁথির জনপ্রিয়তা। এই পুঁথির লেখক বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত জীবন ঘোষাল।

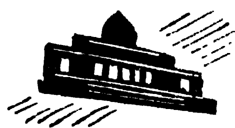
১৯০৫ সালে স্বদেশী যুগে বিলাতী বস্ত্র বয়কটের জন্য স্থানীয় রাজ-পরিবারের রাজা গিরিজানাথ এগিয়ে এসেছিলেন। আধুনিক কালের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ জেলার খ্যাতিমান মানুষ কাশীশ্বর চক্রবর্তী। ইনি আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে গণ-চেতনা জাগিয়েছিলেন এবং তাদের দিয়ে খাজনা বন্ধ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন ১৯৩২ সালে।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে শিক্ষক-নেতা সুরেশ চট্টোপাধ্যায় আন্দোলন করে কারাবরণ করেন।

১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের আগুন দিনাজপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন সরোজ চট্টোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে বালুরঘাট-বাসীরা সেই বিপ্লবে যোগ দেন।

স্বাধীনতার পর নানা বিপর্যয় ও অসুবিধা সত্বেও জেলাটি দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সংযোগকারী জেলা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের এই জেলাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৪



কোচবিহার

কোচবিহার ইংরাজ আমলে ছিল করদ-মিত্র রাজ্য। বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের আগে এ-অঞ্চলে কোচ, মেচ প্রভৃতি উপজাতিদের বাস ছিল। মনে হয় কোচ উপজাতিরা এ অঞ্চলে রাজত্ব করতো, সেই থেকেই জায়গাটির নাম কোচবিহার হয়েছে।

স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগষ্ট, কোচবিহার রাজ্য যোগ দিল স্বাধীন ভারতবর্ষে।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কোচবিহার একটি জেলা রূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হল। পাঁচটি মহকুমায় জেলাটি বিভক্ত। উত্তর পশ্চিম দিকে জলপাইগুড়ি জেলা তাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে আর পূর্ব দিকে আসামের সঙ্গে তার একটা ক্ষীণ যোগসূত্র আছে মাত্র। বাকি প্রায় তিনদিকে পাকিস্তান। উঁচু জমিতে তামাকের চাষ হয়। আর নীচু জমিতে ফলে ধান। কোচবিহারের মাটিতে বালির আধিক্য। হালকা দোঁয়াশ পলিমাটি চুইয়ে জল সহজেই ভিতরে যেতে পারে। বলতে গেলে জেলাটির সবটাই বেশ উর্বর।

অজস্র ছোট-খাট নদী জেলাটির সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে আছে। সমস্ত নদীই প্রায় এসেছে দক্ষিণ দিকে বয়ে। এ সব নদী প্রায় সবই পাহাড়ী। গ্রীষ্মে শীর্ণ শান্ত হয়ে পড়ে থাকে, বর্ষায় ওঠে স্ফীত হয়ে। বিপুল জলধারা বহন করে পাথর নুড়ি নিয়ে ভীষণ বেগে ধেয়ে চলে।

জেলাটির প্রধান নদী তিস্তা জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়ে বয়ে এসেছে কোচবিহারে। কোচবিহারের তামাকের ব্যবসাকেন্দ্র মেখলীগঞ্জ, তিস্তার তীরে অবস্থিত।

কোচবিহারের আর একটি বিখ্যাত নদী জলঢাকা। ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে কোচবিহারে। জেলার এক এক স্থানে নদীটির এক একটি নাম। মহকুমা শহর মাথাভাঙ্গা, জলঢাকার তীরে অবস্থিত। নদীটির স্রোত অতি তীব্র বলে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। জলঢাকার বিদ্যুৎ থেকে সারা উত্তরবঙ্গ উপকৃত হচ্ছে।

তিব্বত থেকে তোরসা নদী জলপাইগুড়ি জেলা পিছনে রেখে কোচবিহারে প্রবেশ করেছে। প্রায় ষাট মাইল সারা জেলার মধ্যে পরিক্রমা করে তোরসা পড়েছে ব্রহ্মপুত্র নদে। তোরসা বড় বিচিত্র নদী। অনেকবার সে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। কখনও পলি দিয়ে কোন ভূভাগকে করেছে উর্বর আর কখনও বা শস্য শ্যামলা জমির পাশ থেকে সরে গিয়ে জায়গাটিকে করে তুলেছে বালুকাকীর্ণ। শেষ অবধি তোরসা দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। ধরলা নামে একটি শাখা দিনহাটা শহরের দু' মাইল পশ্চিমে সিংমারিতে গিয়ে পড়ে আর অন্য শাখাটার নাম তোরসাই থেকে যায়।

কোচবিহারে পাটের চাষও হয়। পূর্ব পাকিস্তানে পাটের জমি বেশী পড়ায় পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলোর হয়েছিল মুস্কিল। কোচবিহার তাদের পাটের অভাব মিটিয়েছিল অনেকটা। দিনহাটা আর মেকলীগঞ্জে পাট চাষ হয় বেশী।

কোচবিহারে কোন বড় শিল্প যখন গড়ে ওঠেনি, তখন কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করে এ জেলার বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই কুটির-শিল্পটি রেশমের সুতো তৈরী। এণ্ডি পোকার চাষ হয় প্রায় জেলার সর্বত্র। এ কাজটা মেয়েরাই করে থাকেন। কোচবিহারের এণ্ডির কাপড়ের খ্যাতি আছে।

এ ছাড়া পিতল কাঁসা-শিল্পেও জেলার খ্যাতি আছে। মৃৎ-শিল্পের ও কাঠের কাজের জন্য এ জেলার শিল্পীরা একদিন যশ পেয়েছেন।

কোচবিহারের রাস্তাঘাটের অবস্থা আগে ভাল ছিল না, রেলপথ সামান্য ছিল। কোচবিহারের পাঁচটি মহকুমায় পাঁচটি বিমান বন্দর তৈরী হওয়ায় দক্ষিণ বাংলার সঙ্গে তার যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর কোচবিহারের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি ঘটেছে দ্রুত। হলদীবাড়ী, পাটগ্রাম, গীতালদহ রাজপাই, জেলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছে।

কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস অতি গৌরবময়। রামায়ণ, মহাভারত ও কালিকাপুরাণে কোচদেশের উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গবিজয়ী বখতিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযানের সময় কোচদেশে এসেছিলেন, ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে।

গৌড়ের নবাব হুশেনশাহ কোচবিহার আক্রমণ করেন; কিন্তু দুর্ধর্ষ কোচজাতি পার্বত্য অঞ্চলে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেয়।

প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখা যায় বর্ত্তমান কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, আসাম (কামরূপ) অঞ্চলে নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করতেন। ইনি দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই অর্জ্জুন কামরূপের রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুর দখল করেন। এই ভগদত্তের বংশে, হর্ষবর্ধনের বন্ধু ভাস্করবর্মার জন্ম।

এই বংশের বিলুপ্তির পর কোচবিহার অঞ্চলটি রাজা ধর্মপাল অধিকার করেন। পরে পালরাজগণ দুর্বল হয়ে পড়লে অঞ্চলটিতে অরাজকতা দেখা দেয়। স্থানীয় কোচ, মেচ প্রভৃতি উপজাতিরা প্রবল হয়ে উঠে।

কোচ উপজাতিদের মধ্যে "হাজো" বলে এক বীরের আবির্ভাব ঘটে। মেচ উপজাতিদের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূঁইয়া ছিলেন হরিয়া বা হরিদাস। এই হরিদাস, বীর হাজোর দুই কন্যা হীরা ও জীরাকে বিবাহ করেন। এঁর চারটি পুত্রের মধ্যে হীরার পুত্র

চন্দন নানা সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। ইনি পিতার সিংহাসনে বসেন। এর পর জীরার পুত্র বিশ্বসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বসিংহ বলতে গেলে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এরই বংশের রাজা নরনারায়ণ ছিলেন অতি ধার্মিক ব্যক্তি। ষোড়শ শতকে গৌড়ের সুলতান দায়ুদ খাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় প্রসিদ্ধ কামাখ্যা মন্দির ধ্বংস করলে ইনি তা পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। এই বংশের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আমলে দিল্লীর বাদশাহ আকবর, পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর কোচবিহার আক্রমণ করেন। রাজা তখন 'আঠারবাড়ী' বলে নূতন রাজধানী নির্মাণ করে সেখানে বাস করেন।

লক্ষীনারায়ণের আঠারজন পুত্র ছিল। প্রতি সন্তানের জন্য তিনি একখানি করে বাড়ী করে দেন বলে নূতন রাজধানীর নাম হয় আঠারবাড়ী। দিল্লীর বাদশাহ শাজাহানের পীড়ার সময় রাজা প্রাণনারায়ণ কামরূপরাজ্য আক্রমণ করেন। ১৬৮৮ সালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কোচবিহার দখল করেন। এবারও পার্বত্য অঞ্চল থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে কোচবিহাররাজ মোঘলসেনাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন।

প্রাচীন ইতিহাসের মত কোচবিহারের আধুনিক কালের ইতিহাসও কম গৌরবের নয়। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের ধর্ম সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কেশব সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। এই বিবাহ সেদিন বাংলা দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

কেশব সেন আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলতায় বিরক্ত হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ মানা হত না। কেশব সেনের চেষ্টায় এই বিশেষ বিবাহ আইন পাশ হয় ১৮৭২ সালে।

এরপর নারী-পুরুষের বিবাহের বয়স নিয়ে তিনি চিন্তা করেন। বাল্যবিবাহ নিন্দনীয় বলে কেশব সেন মনে করতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজে তিনি এই নিয়ম বেঁধে দেন যে কোন ব্রাহ্ম তাঁর চৌদ্দ

বছর বয়সের কম কন্যাকে পাত্রস্থ করবেন না। পাত্রেরও বয়স অবশ্যই একুশ বছর বা তদূর্ধ হবে।

এমনি সময়ে কোচবিহারের রাজমন্ত্রী, নাবালক রাজপুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে কলিকাতায় আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাকা দুর্গামোহন দাশের কন্যার সহিত প্রথমে বিবাহের কথা হয়। কিন্তু দুর্গামোহন ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম মেনে নাবালক রাজপুত্রের সঙ্গে নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলেন না। কিন্তু কেশব সেন নিজের একাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ দিলেন—সে বিবাহও ব্রাহ্মমতে হল না, হল প্রায় হিন্দুমতে। কারণ সে বিবাহের আসরে হর-পার্বতীর মূর্তি রক্ষিত হয়েছিল।

কেশব সেনের এরূপ আচরণে তাঁর তরুণ ভক্তরা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাশ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মরা কেশব সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭৮ সালে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণকে সুশিক্ষিত করার জন্য কেশব সেন তাঁকে কলিকাতায় এনে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দেন। পরে নৃপেন্দ্র নারায়ণ তাঁর স্ত্রী সুনীতি দেবীকে নিয়ে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন।

সুনীতি দেবী বিলাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহ লাভ করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নিত্যেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হলে মহারাণী তার ধর্ম মা হয়েছিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম থেকে নিত্যেন্দ্রনারায়ণের নাম হয় ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ।

সুনীতি দেবী কোচবিহারের মহারাণীরূপে দেশের কল্যাণ সাধন করে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। ভারতবর্ষের কোন মহিলা এর আগে এ উপাধি পান নি। নৃপেন্দ্র নারায়ণের আমলে কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলন দ্রুতবেগে বেড়ে ওঠে।

তবু অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়

জেলায় যখন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে—বৃটিশ করদরাজ্যের প্রজার পক্ষে সে আন্দোলনে সক্রিয় সাহায্য করা সম্ভব হয়নি।

আর্যধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল কোচবিহারে বহু শত বছর আগে। আর্য দেবদেবীর মন্দিরগুলিই তার প্রমাণ। জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর শিবের মন্দিরটিও কোচবিহারের রাজাদের তৈরী। কোচবিহার শহরের মদনমোহন, কালীতারা ও ভবানী দেবীর মন্দিরও কোচ রাজাদের কীর্তি। হিন্দুতীর্থ বারাণসীধামে কোচবিহারের রাজাদের তৈরী কালী ও শিবের মন্দির এখনও বর্তমান।

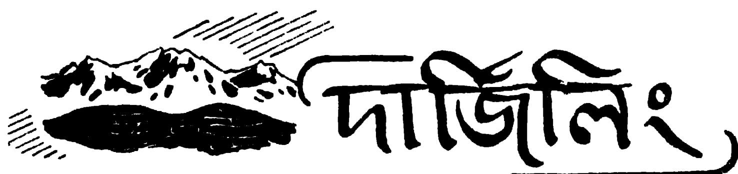
এঁদের আমলেই আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শঙ্করদেব কোচবিহারে আসেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কোচবিহারের মধুপুর ও ভেলাডাঙ্গায় শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ তীর্থ বর্তমান। শঙ্করপন্থী সাধু ছাড়াও কোচবিহারে দামোদরপন্থী বৈষ্ণবদের প্রভাবও কম ছিল না। দামোদরপুর ও বৈকুণ্ঠপুরে দামোদরপন্থী বৈষ্ণবদের দুটি তীর্থক্ষেত্র আজও আছে। কোচবিহার শহরেই একটি জৈনমন্দির আছে।

প্রথমে এসেছে জৈনধর্ম। পরে তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে এখানে তৈরী হয়েছে কালীতারা ও ভবানী দেবীর মন্দির। তারপর একদিন বৈষ্ণবভক্তি সাধনার স্রোতে কোচবিহার প্লাবিত হয়েছে। অতি আধুনিক কালে সেখানে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারও চলেছে।

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও কোচবিহার পিছিয়ে থাকে নি। কোচবিহার সরকারী কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি মনোমোহন ঘোষ। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন দার্শনিক মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ও কোচবিহার কলেজে অধ্যাপনা করে গেছেন।

আজ কোচবিহার জেলাটি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া কাটিয়ে ফেলে আধুনিককালের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। নানাদিকে তার সমৃদ্ধি ও প্রগতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

১৫



সারা পৃথিবীর পর্যটকদের স্বপ্নের দেশ দার্জিলিং। সাদা তুষারে ঢাকা পাহাড়ের সারি দূর দূরান্তে নীল আকাশের কোলে গিয়ে মিশেছে। লম্বা লম্বা উইলো গাছে দুলছে সাইপ্রাস লতা। রডোডেনড্রন পুষ্পগুচ্ছে ছেয়ে আছে বনস্থলী। রুক্ষ পাথুরে পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনে ফুটেছে সাদা রঙের ম্যাগনোলিয়া। একদিকে সুউচ্চ পর্বত আর একদিকে গভীর খাদ। পাহাড়ের কোলে সাদা মেঘের অবিরাম আনাগোনা আর খাদের গভীরে মেঘপুঞ্জ যেন মহাসাগরের ঢেউ। উত্তর দিকে তাকালে দেখা যাবে তুষার ঢাকা পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে রূপ আর রঙের সমারোহ। দক্ষিণে ঘুমপাহাড়ে দৃষ্টি হবে অবরুদ্ধ। পূর্ব আর পশ্চিমে চলে গেছে হিমালয়ের সহস্র যোজনব্যাপী পর্বতশৃঙ্খল। কাছেই রাংনু উপত্যকার চার মাইল চওড়া হাজার ফুট গভীর খাদ সহসা চোখ মেলে দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। এই গভীর খাদের পাশেই সুউচ্চ মাইমন পাহাড়। তারপরই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ বরফের ঢেউ, দূরে আকাশের কোলে হারিয়ে গেছে। ওরই মাঝে যেটি সবচেয়ে উঁচু, ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত মহা নির্জনে তপস্যামগ্ন, সেটিই কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্যের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ কিরীট। এই কাঞ্চনজঙ্ঘার কিছু দূরে নেপাল এলাকায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেষ্ট।

একদিকে দার্জিলিঙের অরণ্য পর্বতের ভীম সৌন্দর্য আর অপরদিকে দক্ষিণের সমতলভূমিতে সবুজ বনের সমারোহ। ভিক্টোরিয়া আর পাগলাঝোরা জলপ্রপাতের ঝর্ ঝর্ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গত করছে তিস্তা নদীর ভৈরব গর্জন। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলার রাজ্যে এলে অ-কবিও কবি হয়ে ওঠে।

দার্জিলিং-এর নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন এখানে দুর্জয়লিঙ্গ বলে শিবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই থেকে দার্জিলিং নাম হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র এই জেলাটির তিনদিক ঘিরে আছে নেপাল, সিকিম, ভূটান। দক্ষিণে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। বর্তমানে চারটি মহকুমায় জেলাটি বিভক্ত। জেলাটিতে ৬৭০টি মৌজা বা গ্রামের মধ্যে ৫০টি গ্রাম এখন প্রায় জনহীন।

উত্তরে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, তার নিচেই বনভূমি। একে তরাই বলে। শিলিগুড়ি আর কার্সিয়াং মহকুমার পূর্বদিকে রয়েছে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল। জেলাটির বাকী অংশে ডুয়ার্স অঞ্চলের চাষের জমি রয়েছে। হিমালয়ের উঁচু জমি ঢালু হয়ে সমতলভূমিতে মিশেছে। সেই ঢালু জমি বা ঢাল অঞ্চলে চা-এর বাগানগুলো তৈরী হয়েছে। তরাই অঞ্চলের বেলে দোঁআশ কালো মাটিতে চাষবাস ভাল হয়।

দার্জিলিঙের মাটিতে হেমাটাইট বা লোহা পাথর পাওয়া যায়। আগে এ থেকে লোহা তৈরী হত। রঙিত নদীর ধারে গ্রাফাইটের সন্ধান মিলেছে।

দার্জিলিঙের প্রধান নদী তিস্তা সিকিম থেকে বেরিয়ে জেলাটিকে দুভাগে ভাগ করে জলপাইগুড়ি জেলাতে পড়েছে। মেচ নদী পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বয়ে গিয়ে জেলাটিকে নেপাল থেকে পৃথক করেছে। কার্শিয়াঙের দার্জিলিং পাহাড় থেকে মহানন্দা নদী বেরিয়েছে।

দার্জিলিং-এর জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। নভেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে। স্থানীয় অধিবাসী ভুটিয়া

লেপচারা ছাড়া প্রায় সবাই তখন নিচের দিকে নেমে যায়। অক্টোবর মাসে আকাশ থাকে পরিষ্কার। তখন দার্জিলিংএ ভ্রমণ-বিলাসীদের ভীড় হয়।

গোড়ার দিকে দার্জিলিংএ আসার পথ ছিল দুর্গম। পরে ন্যারো গেজের লাইন পাতা হয়।

১৮৭৮ সালে তখনকার পূর্ববঙ্গ রেলপথের একটা শাখা শিলিগুড়ি পর্যন্ত খোলা হয়। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ চলে গেছে।

সাত হাজার ফুট উঁচু শহরটিতে উঠবার জন্য ক্ষুদ্র বগীর ট্রেনটি পাহাড় বেষ্টন করে বক্র সর্পিল গতিতে ঝিক্ ঝিক্ করে এগিয়ে চলে। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পের এক মহা বিস্ময়।

দার্জিলিংএর ইতিহাসও বড় বিচিত্র।

বেশীদিনের কথা নয়, ১৮১৫ সালে নেপালী গুর্খাসৈন্য দুর্বল সিকিম রাজ্য আক্রমণ করে সিকিমের রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। সিকিমের রাজা ইংরাজের সাহায্য চেয়ে পাঠান।

ইংরাজসৈন্যের সাহায্যে সিকিমের রাজার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে। তখনকার মত নেপাল-সিকিমের বিরোধ মিটলেও ১৮২৮ সালে আবার নেপালী ফৌজ সিকিমে ঢুকে পড়ে। সে বিরোধেও সিকিমকে সাহায্য করে ইংরাজ।

ফলে সিকিম রাজ্যে ইংরাজদের খাতির বেড়ে যায়। দলে দলে ইংরাজ-পর্যটকরা সিকিম ভ্রমণে যেতে আরম্ভ করেন।

এই সময় আই, ডবলু, গ্রাণ্ট নামে এক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হিমালয় অঞ্চলের গাছপালা পরীক্ষা করার জন্য সৈন্যবিভাগের ক্যাপ্টেন লয়েডকে নিয়ে সিকিম ভ্রমণে যান। তাঁরা দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন।

কিছুদিন এ অঞ্চলে বাস করে এখানকার জলবায়ুও বেশ স্বাস্থ্যকর দেখে তাঁরা ভারতবর্ষের বড়লাট বেন্টিঙ্ক সাহেবকে লিখলেন নেপাল, ভূটান আর তিব্বতের মাঝখানে একটা ইংরাজ উপনিবেশ

হলে ভাল হয়। বেন্টিঙ্ক সাহের লুফে নিলেন এ প্রস্তাব। কারণ তিনি এই অঞ্চলে একটা ইংরাজ-ঘাঁটি তৈরী করার কথা ভাবছিলেন। ভারতের জরিপ-বিভাগের প্রধান কর্মচারী হার্বার্ট সাহেবকে লিখলেন জায়গাটা সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দিতে।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী গ্রাণ্ট আর হার্বার্ট সাহেব জায়গাটা ভালভাবে পরীক্ষা করে বড়লাট বেন্টিঙ্ককে ভাল রিপোর্টই দিলেন। ১৮৩০ সালে বড়লাট বেন্টিঙ্ক সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে ঐ অঞ্চলের ১৩৮ বর্গমাইল জমি তিন হাজার টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত নিলেন। এই জায়গার সীমানা হল উত্তরে রঙ্গি নদী, পূর্বদিকে রঙ্গমাই ও মহানন্দা।

নেপাল যুদ্ধে প্রসিদ্ধ ক্যাম্পবেল সাহেব ঠিক করলেন এখানে অসুস্থ ইংরাজদের জন্য একটা স্বাস্থ্য-নিবাস করবেন। মাত্র কুড়িটি পরিবার নিয়ে দার্জিলিঙের নতুন জনপদ গড়ে উঠলো। এমনি সময় এক বিপদ ঘটলো।

সিকিমরাজার মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত হলেন এক তিব্বতী কূটনীতিজ্ঞ। তাঁর পরামর্শে সিকিমরাজ সমস্ত ইংরাজ-পর্যটকদের সিকিম থেকে বিতাড়িত করলেন।

স্বাস্থ্য-নিবাসের ডাক্তার হুভার আর ক্যাম্পবেল সাহেবকে বন্দী করে নিদারুণ অত্যাচার করা হল।

খবর কলকাতায় পৌছলো। ক্ষিপ্ত ইংরাজগণ বড়লাটকে সিকিমে সৈন্য প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। ইংরেজ সৈন্য আসছে শুনে ভীত হয়ে সিকিমরাজ ক্যাম্পবেল আর ডাঃ হুভারকে মুক্তি দেয়।

তাঁরা দীর্ঘ পার্বত্যপথ অনাহারে অতিক্রম করে করে ইংরেজ এলাকায় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হজসন সাহেবের বাংলোয় পৌছান। তাঁদের অনাহার-শীর্ণ মূর্তি দেখে হজসন ভূত ভেবে আঁতকে উঠেছিলেন।

সিকিমরাজকে শাস্তিস্বরূপ তরাই অঞ্চলটিকে ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হয়। এর পর ১৮৫৪ সালে ইংরাজ-সৈন্য ভূটানরাজ্যের কিছু

অংশ তিস্তার পূর্বদিকের ৪৮৭ মাইল অধিকার করে দার্জিলিঙের আয়তন বৃদ্ধি করে। ক্রমশঃ দার্জিলিং একটা জেলার রূপ পায়।

দার্জিলিংএ দেখবার আর বেড়াবার মত জায়গা অনেক।

জলাপাহাড়, সিঞ্চললেক অবজারভেটরী, ভিক্টোরিয়াপ্রপাত সারা পৃথিবীর পর্যটকদের মুগ্ধ করে। পাহাড়ের চূড়ো ছেঁটে সমতল করে তৈরী দার্জিলিং-এর ম্যাল ভ্রমণকারীদের কাছে স্বর্গ। টাইগারহিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় কুয়াশা-মুক্ত ভোরে।

আগে দার্জিলিঙের সবটাই ছিল অরণ্য। তরাই ছিল দার্জিলিং জেলার অরণ্য-সম্পদের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের দু' বছরের মধ্যে বোধ করি শ'দুয়েক লোকও সেখানে বাস করতে যায় নি। কিন্তু যেদিন দার্জিলিং অঞ্চলে চা-এর চাষ আরম্ভ হ'ল সেদিন থেকেই চার্জিলিং এর সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

কিছুকাল পরে কার্সিয়াংএ চা-এর চাষ আরম্ভ হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। বিলাতে সারা পৃথিবীর চায়ের প্রদর্শনীতে কার্সিয়াং-এর চা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। সেদিন থেকেই দার্জিলিং-এর চায়ের সুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। দার্জিলিং-এ প্রথমে ৬২টা চায়ের বাগান ছিল। কুড়ি বছরের মধ্যে সংখ্যাটা তিনগুণ বেড়ে গেল।

কর্মী মেয়েরা চায়ের বেঁটে বেঁটে গাছ থেকে সবুজ পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহ করে পিঠের ঝুড়িতে রাখে। তারপর সেই পাতা ও কুঁড়ি বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকিয়ে চায়ের পাতা তৈরী হয়।

এই জেলার মংপুতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ, সিন্‌কোনা চাষের সরকারী ব্যবস্থা আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের বিদুষী কন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর গৃহে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। কালিম্পংএ গৌরীপুরের জমিদার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ এসে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাস করতেন।

এই কালিম্পং থেকেই কবি তাঁর জন্মদিনে টেলিফোন মারফত সুবিখ্যাত 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করে দেশবাসীকে শোনান। কালিম্পংএ তখন টেলিফোনের লাইন বসানো হয় নি

অল ইণ্ডিয়া রেডিও-কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় লাইন বসানো হয়। তাঁরা কবির কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ধরে সারা দেশে শোনাবার ব্যবস্থা করেন। কাছেই কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ একটা বাড়ী তৈরী করান। সম্প্রতি সেখানে সরকারী উদ্যোগে চালিত একটি চারু-শিল্প বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও তার বোটানিক্যাল গার্ডেন একটি দেখবার বস্তু। এখানে নানা জাতীয় দুষ্প্রাপ্য আর্কিড সংগৃহীত হয়েছে।

এখানকার ষ্টেপ-এসাইড নামক বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ভারতবর্ষের সর্বত্যাগী শ্রেষ্ঠ জননায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহু শ্রমে অর্থসংগ্রহ করে বাড়ীটিকে ক্রয় করে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। আজ এখানে অসুস্থ মানুষেরা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এসে বাস করেন।

দার্জিলিঙে সিস্টার নিবেদিতার জীবনাবসান ঘটে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহে। এখানকার শ্মশানে তাঁর একটি সমাধি মন্দির আছে।

শিলিগুড়ির কয়েক মাইলের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জায়গাটির নাম রামমোহনপুর।

বাংলাদেশের নব-জাগরণের হোতা রাজা রামমোহনের পুণ্য নাম থেকেই স্থানটির নামকরণ হয়েছে। কাছেই জলপাইগুড়ি সীমান্তে বাগডোগরায় বিমান বন্দর তৈরী হয়েছে। ফলে বাংলার বিশেষ করে কলকাতার সঙ্গে দার্জিলিং জেলার যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

ফারাকায় গঙ্গার উপর সেতু নির্মিত হলে কলিকাতা থেকে সোজা দার্জিলিংএ আসা যাবে। এখন আসাম-বেঙ্গল লিঙ্ক রেলপথ জেলাটির মধ্য দিয়ে গিয়ে আসামের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগসূত্র বজায় রেখেছে। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং হয়ে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে চলে গেছে সিকিম রোড।

দার্জিলিং-এর পাহাড়ী পথগুলো বড় চমৎকার। ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের কোল দিয়ে দূর দূরান্তে চলে গেছে পথগুলো। লেপচা ভুটিয়ারা পিঠে ঝুড়িতে করে অথবা ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসে কমলা লেবু। দার্জিলিং-এর সুমিষ্ট কমলা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আদর পায়। কমলা লেবু ছাড়া কলা, পীচ, ন্যাসপাতি, পেঁপেও জেলাটিতে প্রচুর ফলে। শীতের সময় কফি কড়াইশুঁটির ফলনও ভাল। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে থাক কেটে কেটে চাষের ব্যবস্থা হয়।

দার্জিলিং জেলার অধিবাসী ভুটিয়া লেপচারা অধিকাংশই বৌদ্ধ। আজও দার্জিলিং-এর অনেক পার্বত্য গুহা-মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের পূজা ও উপাসনা চলে।

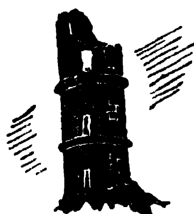
ইংরাজ আমলে খৃষ্টান মিশনারীরা দার্জিলিং অঞ্চলে বিদ্যালয় খুলে স্থানীয় অধিবাসীদের লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতেন।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণমিশন এই জেলায় কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করে স্থানীয় উপজাতিদের বিদ্যাশিক্ষা দিচ্ছেন, যাতে তারা আর ধর্মান্তর গ্রহণ না করে।

১৯৫৩ সালের মে মাসে দার্জিলিং-এর এক দরিদ্র শেরপা বঙ্গবাসী তেনজিং বৃটিশ পর্বতারোহী এডমণ্ড হিলারীর সঙ্গে একযোগে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টে আরোহণ করে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তেনজিংকে দার্জিলিংএ স্থায়ীভাবে বাসের ব্যবস্থা করে দেন। দার্জিলিংএ পর্বতারোহীদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কলেজের অধ্যক্ষ হন তেনজিং নোরকে।

১৬



মালদহ

প্রাচীন ইতিহাসের ঐশ্বর্যে ভরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা জেলা মালদহ। গঙ্গা যেখানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে তার উত্তর তীরে মালদহ জেলার অবস্থান। একটি মাত্র রেলপথ জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেছে।

ইংরাজ আমলে মালদহ ছিল রাজসাহী বিভাগে। তারপর দেশ ভাগাভাগির সময় মালদহের গোটা-চারেক বড় থানা পাকিস্তানে যায়। আর বাকী অংশ বর্তমান মালদহ জেলা হিসাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়, অধুনা জলপাইগুড়ি বিভাগে। জেলাটির পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী। উত্তরে বিহার, পশ্চিম দিনাজপুর আর পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান। মহানন্দা নদী জেলাটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। মহানন্দার পশ্চিমদিকে বিহার থেকে কালিন্দী নদী আর মহানন্দার পূর্বদিকে টাঙ্গন এসে পড়েছে।

মহানন্দার পূর্বদিকে উত্তর বাংলার সুবিখ্যাত বরেন্দ্রভূমি। কাঁকর-ভরা লাল মাটির ঢেউ দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেছে। বর্ষার শেষে এই লাল মাটিতে আমন ধানের ফলন দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মহানন্দার পশ্চিম তীরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে কালিন্দী নদী। এর উত্তর ভাগের নাম ঢাল। এই ঢাল অঞ্চলে মালদহের

বিখ্যাত আমবাগানগুলি অবস্থিত। কালিন্দী নদীর দক্ষিণের অঞ্চলটিকে বলা হয় দিয়ারা। এখানে প্রচুর বোরো ধান হয়।

রাতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক মালদহ আমের জন্য বিখ্যাত। দিয়ারায় তুঁতের চাষ হয়। মালদহের রেশম-শিল্পের খ্যাতি একদিন বাংলা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

মালদহ জেলাটির খ্যাতি আম ও রেশম-শিল্পের জন্য নয়, তার প্রাচীন ইতিহাসের জন্য। সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এমন সুপ্রাচীন ইতিহাসের ঐশ্বর্য আর কোন জেলায় বোধ করি নেই।

মালদহ জেলাটি ছিল সুপ্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পাল রাজগণের আমলে গৌড়রাজ্যের খ্যাতি ছিল সারা ভারতবর্ষে। সারা আর্য্যাবর্তের ভাষাকে লোকে গৌড়ের ভাষা বলতো। রাজধানী গৌড়ের নামেই রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল গৌড়। অনেকে অনুমান করেন 'গুড়' থেকেই গৌড় শব্দটি এসেছে। এ অঞ্চলে তখন গুড়ের কারবার চলতো।

একখানি অতি প্রাচীন তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ধর্মাদিত্য বলে একজন শৈবরাজা গৌড়ে চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। ষষ্ঠ শতকে ঈশান বর্মা গৌড় জয় করেন। মহারাজা শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণ-সুবর্ণ থেকে গৌড় শাসন করতেন। পাল আমলে সম্রাট ধর্মপাল গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। তাঁর সময় গৌড়ের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দু আমলের গৌড় রাজধানীর চিহ্ন মাত্র নাই। অনেকে অনুমান করেন বর্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের কয়েক মাইল দূরে পিছলী গঙ্গারামপুরে কালিন্দী নদীর তীরে ছিল পালবংশের রাজধানী গৌড়। পালরাজাদের হাত থেকে গৌড় অধিকার করেন সেনবংশীয়গণ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন বর্তমান মালদহ জেলার পূর্ব প্রান্তে বল্লাল বাড়ী নামে এক স্তূপাকৃতি উচ্চ ভূমিতে সেনরাজ-গণের রাজধানী গৌড় অবস্থিত ছিল। সেনরাজবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি রাজা লক্ষ্মণ সেন একটি নূতন রাজধানী তৈরী করেন। সেটির নাম

লক্ষ্মণাবতী। ইংরেজবাজারের কাছেই সেটি অবস্থিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

লক্ষ্মণ সেনের পর গৌড় মুসলমানদের অধিকারে যায়। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দীন ইলিয়াম শাহ পুরানো গৌড়ের কুড়ি মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এর নতুন নাম হয় ফিরোজাবাদ। মহানন্দা আর কালিন্দী নদীর সঙ্গমে নিমাসরাই ছিল পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত বন্দর। শ'খানেক বছর পরে সুলতান নাসিরুদ্দীন পুনরায় গৌড় নগরীতে রাজধানী ফিরিয়ে আনেন।

এই পাণ্ডুয়াতেই রাজা গণেশ মুসলমানদের পরাস্ত করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। বাংলার ইতিহাসের এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এঁর আমলেই কবি কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় যে গৌড়েশ্বরের বর্ণনা আছে তাতে মনে হয় ইনি রাজা গণেশ।

পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন হুসেন শাহ। এর আমলে গৌড়ের একাংশের নাম বদল করে রাখা হয় হোসেনাবাদ। বাবরের পুত্র হুমায়ুন গৌড় দখল করে এর নাম রাখেন জিন্নতাবাদ অর্থাৎ স্বর্গনগর। সত্যই সে আমলে অপূর্ব কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ আর মসজিদের সৌন্দর্য্য গৌড়কে স্বর্গের শোভাই দান করেছিল। ১৫৩৮ সালে শেরশাহের সৈন্যদল গৌড় আক্রমণ করে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তারপর ১৫৫০ সালে দারুণ মহামারীতে গৌড়নগরী জনশূন্য হতে আরম্ভ হয়।

এই সময় গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন শূরবংশীয় নবাব। তাঁদের হাত থেকে কাররাণী বংশীয় জনৈক সেনানায়ক গৌড় দখল করেন। এই বংশের দায়ুদ খাঁ গৌড় থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। এই দায়ুদের কর্মচারী ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য। দায়ুদের সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়, যাঁর নামে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম একদিন ভয়ে কাঁপতো। কালাপাহাড়ের আসল নাম ছিল কালাচাঁদ চক্রবর্তী, ইনি ব্রাহ্মণ সন্তান। সুলতান-

কন্যা দুলারী বেগম এঁকে বিবাহ করতে চান। নবাব কালাচাঁদকে ডেকে পাঠান। কিন্তু কালাচাঁদ তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে রাজি হন না। কিন্তু তখনকার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ এই সামান্য কারণে কালাচাঁদকে জাতিচ্যুত করেন। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে কালাচাঁদ নবাব-কন্যাকে বিবাহ করে নবাবের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে আসাম থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত হিন্দু ধ্বংস করতে আরম্ভ করেন। এখনো নাকি উড়িষ্যায় পুরীর মন্দিরে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। যেখানে যত ভগ্ন হিন্দুমন্দির বা দেবদেবী দেখা যায় তার জন্য আজও কালাপাহাড়কে দায়ী করা হয়।

পাহাড়ের মত বিপুলায়তন কৃষ্ণবর্ণ দেহের অধিকারী ছিলেন বলেই বোধ করি লোকমুখে তাঁর কালাপাহাড় নামকরণ হয়েছিল। আকবরের সেনাপতি মুনীম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে কালাপাহাড়ের পতন ঘটে।

মুনীম খাঁ আবার পুরাতন গৌড়েই মোঘল রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু তখন গৌড়ের জলবায়ু এতই অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছিল যে মুনীম খাঁ তাঁর বহু সৈন্যসামন্তসহ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। তখন মানসিংহ রাজমহলে বাংলার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সেখান থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ইসলাম খাঁ।

গৌড়নগরী আজ ইংরেজদের রেশমকুঠি ইংরেজবাজারের দশ মাইল দক্ষিণে জঙ্গল ঢাকা পড়ে আছে। ট্রেন থেকে নেমে রিক্সা বা বাসে করে লোকে প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যায়।

মালদহের কথা বলতে গিয়ে মালদহের বিখ্যাত লোক-সঙ্গীত গম্ভীরাগানের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। গম্ভীরা বাংলার গ্রাম্যজীবনের গান। এ গান শিবকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয়।

মালদহের নিজস্ব ভাষা ও সুরে সমৃদ্ধ এই গান জনসাধারণের হৃদয় জয় করে সহজে। গানের বিষয়বস্তুও বিচিত্র। সমসাময়িক-

সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় ছাড়া জাতীয়-ভাবোদ্দীপক ব্যাপারও গানের মধ্যে স্থান পায়।

পালা-জাতীয় গম্ভীরা গানকে বলা হয় 'আলকাফ' গম্ভীরার পালা। সারা রাত ধরে গম্ভীরার পালা চলে।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে গম্ভীরা গানের আসর বসে। চলে এক মাস। মূল গায়েনকে দেশের নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। গানের আসরে সময়ে সময়ে সময়োপযোগী কথা তৈরী করে তখুনি সুর গেয়েও দিতে হয়। অষ্টাদশ শতকের কলিকাতায় কবিওয়ালাদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়।

বৃটিশ আমলে অনেক গায়ক নিপীড়িতও হয়েছেন তাঁদের ভাবোদ্দীপক স্বদেশী গানের জন্য। দু'একটা নমুনা দেওয়া হ'ল।

শিব, মোরা আর কত হয়ে নত, পূজবো তোমায় ঈশান,
আজ সোনার বাংলা হ'ল জংলা ভুলে গিয়ে বেদপুরাণ।
দেব শূলপাণি হয়ে ব্রহ্মা তুমি আর কোন ধ্যানে
কাশ্মীরে হানাদার করিছে অত্যাচার
কত শত লোক মরছে পরাণে।

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের কাছেই রামকেলী গ্রাম। কাছেই সনাতন সরোবর। সনাতন সরোবরে স্নান করে কৃষ্ণপূজা করার রীতি। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে রামকেলীতে বৈশাখী উৎসব হয়। এই রামকেলীতে নবাব হুসেনশাহের আমলে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য-দেব। তিনি বৃন্দাবন যাত্রার পথে রামকেলীর একটি কদম গাছের নিচে বিশ্রাম করেছিলেন। হুসেনশাহের দবীর খাস (একান্ত সচিব) রূপ আর সনাতন মল্লিক (রাজস্ব মন্ত্রী) গোপনে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীচৈতন্যের লোকপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন হুসেনশাহ। পাছে শ্রীচৈতন্যের কোন ক্ষতি হয়, তাই রূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যকে শীঘ্র গৌড় ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের আকর্ষণে সংসার ত্যাগের সংকল্প করেন। রূপ প্রথমেই চাকুরী ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সন্ধানে যাত্রা

করেন। সনাতনকে ছাড়তে হুসেনশাহ রাজি হন না। কারণ এমন সুদক্ষ কর্মচারী সহজে মিলবে কোথায়? কিন্তু সনাতন বারংবার চাকুরী ছাড়ার জন্য জেদ করতে থাকায় হুসেনশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বন্দী করে গৌড়ের বিখ্যাত চিকা মসজিদে আটক করে। রাখেন। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের উপর সনাতনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কাজেই একদিন গভীর রাত্রে কারারক্ষীকে স্বর্ণমুদ্রায় বশীভূত করে তিনি পলায়ন করেন। নিজ সংসার খরচের জন্য স্থানীয় এক মুদীর কাছে বিশ সহস্র টাকা জমা রেখে যান।

দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করে সনাতন কাশীধামে ১৫১৩ সালে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। চৈতন্যের আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে বাস করতে থাকেন। এই বৃন্দাবনে সম্রাট আকবর সনাতনের অতুল বিদ্যা ও ভগবদ্ ভক্তির কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ১৫৬৪ সালে সনাতন পরলোক গমন করেন।

এদিকে রূপ শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে যবন কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত চুরাশিটি হিন্দুতীর্থ অনেক শ্রমে আবিষ্কার করে সুসংস্কৃত করেন। চুয়াল্লিশটি দার্শনিক-গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম বিদগ্ধমাধব। রূপ ও সনাতন দুই ভাই মিলে লক্ষাধিক সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে গিয়েছেন।

এঁদেরই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। ইনি বৈষ্ণবজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। রামকেলীর কাছেই সনাতনদীঘি ও রূপসাগরদীঘি দুই ভাইয়ের পুণ্য নাম আজও ধারণ করে আছে। জীব গোস্বামীর শ্যামকুণ্ডও রামকেলীর গৌরব। এখানে এক প্রস্তরখণ্ডে একটি পদচিহ্নের ছাপ আছে। ওটি শ্রীচৈতন্যের বলে জনসাধারণের বিশ্বাস। জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তিতে শ্রীচৈতন্যদেব যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেখানে আজও মেলা বসে। রামকেলীর আর এক নাম গুপ্তবৃন্দাবন।

রামকেলীর খ্যাতি আজও অম্লান। কিন্তু ঐশ্বর্যের লীলাভূমি নবাবী আমলের গৌড় আজ অরণ্যের অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে।

মুসলমান সুলতান সেকেন্দারশাহ গৌড় দখল করে কাছেই আদিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করান ১৩৬৯ সালে। এছাড়া নসরৎ শাহের আমলে তৈরী বড় সোনা মসজিদকে গঠন-বৈচিত্র্য ও স্থাপত্যের উৎকর্ষে গৌড়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলা চলে।

ছোট সোনা মসজিদের প্রাঙ্গণে রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিনের স্ত্রী-পুত্রের সমাধি আছে। এই মসজিদের দরজায় বৌদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। দেওয়ালেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আছে। মনে হয় কোন হিন্দুমন্দিরের পাথর দিয়ে এই মসজিদটি তৈরী। অবশ্য গৌড়ের প্রাসাদ বা মসজিদের পাথর পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তা পূর্ববর্তী হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কোন মন্দির বা প্রাসাদ থেকে সংগৃহীত। প্রসিদ্ধ কদমরসুল মসজিদটি দেখলেই এটা বেশ বোঝা যায়। এই মসজিদে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি ফতে খাঁর সমাধি আছে।

গৌড়ে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আছে ১৪৮৫ সালে তৈরী ফিরোজ শাহের চুরাশি ফুট উঁচু মিনার। এখান থেকে সারা গৌড়নগরা পরিদর্শন করা হত।

গৌড়যুগের প্রবেশদ্বারটির নাম দখল দরওয়াজা। এ দরজা দিয়ে পাশাপাশি তিনটি হাতী গলে যেতে পারে। হাবেলী খাস গৌড় রাজপ্রাসাদের প্রাচীন নাম। অনেকে বলেন এটি নাকি হিন্দু আমলের প্রাসাদ। এখানে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের সমাধি আছে। গোলাম হোসেন বাংলা দেশের একটি ইতিহাস লিখে খ্যাতি পান।

পালরাজাদের আমলে গৌড়ের গৌরবের যুগে সোমপুর, বিক্রমশীলার বিখ্যাত বিহারগুলি গড়ে উঠেছিল। সেখানে এশিয়ার দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসতেন বিদ্যাচর্চার জন্য। সমুদ্রপারের দেশে সুমাত্রা, জাভা, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিত আর বৌদ্ধশ্রমণরা গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রখ্যাত বরবুদুরের ভাস্কর্য ও শিল্পকলার সৃষ্টির মূলে ছিল দুই বাঙালী

ভাস্করের সাধনা। এঁরা হলেন বীটপাল আব ধীমান—এঁদের বাড়ী ছিল প্রাচীন গৌড়ভূমিতে।

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে গৌড় নামটি রয়ে গেছে। একদিন এই গৌড়রাজ্য তথা আধুনিক কালের মালদহের পথেই আর্য-ভাষাভাষী মানুষ ও আর্যসভ্যতা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। এই জেলাটিতে তাই মৈথিলী ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি রাজবংশী, কোচ, পালিয়া, সাঁওতাল প্রভৃতিদেরও দেখা যায়।

আগেই বলা হয়েছে মগধ অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি পূজা-অর্চনা নিয়ে বাংলদেশে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তখন যেমন এখনও—শত শত বৎসর পরেও—মালদহ জেলায় বাস করে আসছেন সাঁওতাল, রাজবংশী, পালিয়া, কোচ প্রভৃতি বাংলার আদিম অধিবাসীরা। তাদের প্রাচীন লোক-সংস্কৃতি আজও বজায় আছে। কিছু সাঁওতালকে খৃষ্টান করেছে বিদেশী খৃষ্টান মিশনারী পাদরীরা।

বিহারের জনৈক নেতা সাঁওতালদের 'ঘেরোয়ার' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায় পচাই মদ আর মাংস খাওয়া ত্যাগ করেছে। এরা ছাড়া মালদহে সাধারণ সাঁওতালরাও রয়েছে। তাদের মধ্যে মুরমু, হাঁসদা, টুডু, সোবে প্রভৃতি বারোটি উপশ্রেণী আছে। রাজবংশীদের মধ্যে মঙ্গোল রক্ত আছে। এরা উপবীত ধারণ করে। সাঁওতালদের সর্দারকে বলে মাঝি আর এদের দলপতিকে মহৎ মণ্ডল বলা হয়। এরা চাষবাস করতে পটু।

পালিয়াদের মধ্যে একটি শ্রেণী নিরামিষাশী। এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। পৈতাও ধারণ করে। আর এক শ্রেণীর পালিয়া নিজেদের গৌড়বাসী বলে মনে করে। তারা হিন্দুদের আচার আচরণ অনুসরণ করে।

মালদহের সাঁওতালদের প্রসিদ্ধ লোকউৎসবের নাম বাদনা। আমন ধান কাটা শেষ হলে এ উৎসব হয়।

মালদহের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভূমিতে হিন্দু-বৌদ্ধযুগে অনেকে অসাধারণ মনীষী জন্মলাভ করেছেন। ময়ূরেশ্বরী গ্রামের চক্রপাণি

দত্ত একাদশ শতকে আবির্ভূত হন। শব্দরত্নাবলী বলে তাঁর রচিত অভিধান তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দেয়।

রাজা মহীপালের সভাকবি ছিলেন প্রখ্যাত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার হলায়ুধ মিশ্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ আর তন্ত্রের সার নিয়ে মৎস্যসূক্ত রচনা করে যশোলাভ করেন। গৌড়ভূমি তথা লক্ষ্মণ সেনের আনুকূল্যে যে সারস্বত সাধনা হয়েছিল তা সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় কবি জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ প্রভৃতি বিদগ্ধ মনীষিগণ তাঁদের সাধনার দ্বারা বঙ্গদেশের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন।

আধুনিককালেও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মালদহ জেলা পিছিয়ে নেই। এই জেলায় রজনীকান্ত গুপ্ত গৌড়ের ইতিহাস রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন।

সুপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই জেলার সুসন্তান। ইনি রবীন্দ্র নাথের স্নেহচ্ছায়ায় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে খ্যাতি লাভ করেন। সংস্কৃত ইংরাজী ছাড়াও পালি ও তিব্বতী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত।

গঙ্গার উপর ফারাক্কা সেতু নির্মাণ শেষ হলে কলিকাতার সঙ্গে মালদহের সরাসরি যোগসূত্র গড়ে উঠবে। জেলাটি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছে।